ধূসর গোধূলি

বুদ্ধদেব বসু

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

আজকাল প্রায়ই আমার অপর্ণা-দিকে মনে পড়ে। দিনের বেলায়, ঠাশা কাজের মধ্যে কোনো বিরল একটু ফাঁকে হঠাৎ যেন অতীত থেকে হাওয়া এসে লাগে, বুকের মধ্যে জাগে ঢেউ : যেন চারদিককার কাজের দেয়াল দূরে সরতে-সরতে যায় মিলিয়ে, উপস্থিত অস্পষ্ট হ'তে-হ'তে মুছে যায়—আর সেই শূন্যের মধ্যে হঠাৎ একটা শারীরিক স্পর্শের মতো অনুভব করি অপর্ণা-দিকে। নয়তো কোনো ফাঁকা মুহূর্তে দৈবাৎ জানলা দিয়ে চোখ গিয়ে পড়ে বাইরে—নীল আকাশ ঝিমঝিম করছে রোদে ; কী যে হয়, চোখ ফিরিয়ে আনতে ভুলে' যাই, ভুলে' যাই কাজ আছে প'ড়ে ; হঠাৎ মনে প'ড়ে ভারি অবাক লাগে অপর্ণা-দিকে আর কখনো দেখবো না। কখনো, কখনো না! বিশ্বাস করা যায় না, ঠাট্টা মনে হয়। আশ্চর্য, অপর্ণা-দিকে যে আর কখনো দেখবো না! রাস্তায় বেরোলেই এত লোক, এত লোকের সঙ্গে এত রকম কথা, এত ক্লান্তি প্রতিদিনের শেষে। ক্লান্তি, ক্লান্তি। ক্লান্তি, ক্লান্তি, ক্লান্তি : এ-ই হচ্ছে জীবনের ছন্দ। এই ছন্দেই হৃৎপিণ্ড রক্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরে, মস্তিষ্কের কোষে-কোষে এই ছন্দেই চিন্তার, কল্পনার আলোড়ন। একটা শান্ত-ধূসর আবহাওয়া যেন চারদিক থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, আমি যেন আস্তে-আস্তে তার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছি, হারিয়ে যাচ্ছি। একটা চরম বিরতি, অবসান : তারই দিকে যেন ভেসে চলেছে আমার দিন আর রাত্রি, দিনের আর রাত্রির স্বপ্ন, স্বপ্ন আর আমার কল্পনা। একে ঠেকিয়ে রাখি, এমন সাধ্য আমার নেই। ইচ্ছাও নেই।

আমি হ'তে দিচ্ছি, আমি ভেসে যাচ্ছি। সেটাই সহজ। এতদিন যাকে বাস্তব ব'লে জেনে এসেছি, যার জন্য এতদিন ধ'রে এত যুদ্ধ, সংঘাত আর তিক্ততা—আজ তার ভিৎ উঠেছে ন'ড়ে; প্রকাণ্ড ইমারৎ টলমলো, সবসুদ্ধু চুরমার হ'য়ে ভেঙে পড়লো ব'লে। পড়ুক ভেঙে; সেই শব্দ শোনবার অপেক্ষায় আনন্দে অধীর আমার হৃদয়। এমনিও, বর্তমানের মুখের উপর স্বপ্ন বুনে যাচ্ছে জাল, যথেচ্ছ লাগিয়ে যাচ্ছে কল্পনার রং—সেটাই যে সত্যি নয় কে জানে। আমাদের ভাবনা দিয়েই আমরা বাঁচি, বস্তুর পরিমাণ দিয়ে তো নয়। সময়-অনুসারে আমি এখন যেখানে আছি, সেটা নেহাৎই ঐতিহাসিক তথ্য: জিগেস করলে অস্বীকার করতে পারবো না, কিন্তু মন সায় দেবে না তাতে। স্বপ্নই আমার সত্য, এই হ'লো আমার মনের কথা। খবর-কাগজের পৃষ্ঠায় যে-সময় দিনের পর দিন এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে আমার জীবন নেপথ্যে ব'য়ে যাচ্ছে এক স্বতন্ত্র স্রোতে: যারা সরকারি তথ্যের ভক্ত, তাদের তা দেখবার দরকার করে না; বস্তুত, দেখা অসম্ভব। সে-জীবন একান্তে আমার, সে-জীবন একান্তই আমার। স্বপ্নই সত্য সেখানে।

সেই স্বপ্ন আর কল্পনার ছায়াময় আলো আজ সবচেয়ে বেশি ক'রে পড়েছে আমার অপর্ণা-দির মুখের উপর। এটা আশ্চর্য; কারণ সে-সময়ে তাঁর প্রতি আমার খুব গাঢ় মমতাবোধ ছিলো ব'লে মনে পড়ে না। তখন, বরং, তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে যে-একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, তাকে নিয়েই

আমার মন ভ'রে ছিলো বেশি। তার জন্য আমি ম'রে যেতে পারতুম তখন। তার জন্যই অপর্ণা-দির মূল্য ছিলো আমার কাছে। আর এখন—তাকে যে ভুলে' গিয়েছি, তা নয়; বরং সহজেই মনে করতে পারি। বড়ো বেশি সহজে। তার কথা ভাবতে বুকের ভিতরে কোনোখানেই ঢেউ দেয় না। সেটাই আশ্চর্য।

অনেক রাত ক'রে আমি শুতে চাই। প্রায়ই, ঘুমের আগেকার অন্ধকারকে কেউ যেন কালো পরদার মতো দু'হাতে সরিয়ে দেয়, তার আড়ালে দেখতে পাই অপর্ণা-দির মুখ। যেন আমারই কল্পনা থেকে নিষ্কাষিত এক স্ত্রীমূর্তি বেরিয়ে আসে অন্ধকার ঠেলে'—বিশাল অন্ধকার, সীমাহীন, সময়হীন। ম্লান সেই মুখ, একটি শ্লথ চুল গোল হ'য়ে পড়েছে শাদা কপালের উপর। সে-মুখের বিষাদ ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটু হাসিকে আরো মধুর ক'রে তুলেছে। বোজা চোখের দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে থাকি: কোনো কথা হয় না; দু' জনের মধ্যে ভাষাহীন একটা সংস্পর্শ। অপর্ণা-দি বুঝতে পারেন আমি তাঁকে দেখছি; আমি জানি, অপর্ণা-দি বুঝতে পারেন। হয়তো কখনো ঠোঁট ন'ড়ে ওঠে তাঁর, কথা শুনতে পাই না, দরকার করে না শোনার। কখনো বা প্রশ্ন ফুটে ওঠে তাঁর নরম-নীল চোখে; আর সেই দৃষ্টির মধ্যেই উত্তর থাকে প্রচ্ছন্ন। যেন দুটো চেতনা বিপরীতমুখী স্রোতের মতো পরস্পরের মধ্যে মিশে যাচ্ছে, আমাদের মাঝখানে যেন সময়ের-কোনো ছেদ

নেই, দু' জনের অন্তরঙ্গতা মনের জটিলতম পথে নিয়ে যাচ্ছে মশাল জ্বালিয়ে। ভারি ভালো লাগে। তারপর কখন সে-সুখ ঘুমের ঘন অরণ্যে হারিয়ে যায়, আমি পাশ ফিরে শুই, ঘুমিয়ে পড়ি।

আজ মনে হচ্ছে, অপর্ণা-দিকে আমি কতটা ভালোবাসতুম, তা নিজেই তখন বুঝতে পারিনি। এমনকি, তাঁর মৃত্যুর খবরেও যে শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলুম তা নয়। নিজের জন্যই তখন দুঃখ করবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। তাছাড়া, তখন আমার যে-বয়স, তাতে আমার মন সবেমাত্র নিজেকে মেলে' দিয়েছে পৃথিবী ভ'রে : সে তখন ভাবের সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে কত অজানিত দিগন্তে, কত নতুন আবিষ্কারের সন্ধানে, চিন্তার ক্ষেত্রে সে তখন দুঃসাহসী বীর : গ্রহণ করতে, জানতে, পরীক্ষা করতে সে তখন ব্যস্ত। সে-বয়সে মানুষ-যে সহজে শোক কাটিয়ে উঠতে পারে, তার কারণ যৌবনের লঘুচিত্ততা নয়, যৌবনের কোনো বাধাকে স্বীকার না-করবার শক্তি। কারণ শোক একটা বাধা, একটা পিছু-টান, তা আমাদের পায়ে ধ'রে আঁকড়ে প'ড়ে থাকে, এগোতে দেয় না। তখন মানুষ ইচ্ছে ক'রে দুঃখী হয়, মধুর একটু মন-খারাপ করে, সে-সব তার নিজেরই সৃষ্টি। বাইরে থেকে আসে যে-দুঃখ, তাকে সে আমল দিতে চায় না, দিতে পারে না। ছটফট করে, দেখতে-না-দেখতে পালিয়ে যায়। সে-বয়সে স্মৃতি একটা বোঝা, জঞ্জাল। ওসব ফেলে' দাও, হালকা করো নৌকো, তুলে দাও পাল।

ধূসর গোধূলি

কী অনায়াসেই অপর্ণা-দি আমার মন থেকে অপসৃত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটার বিসদৃশতা উপলব্ধি করবারও সময় ছিলো না, দ্রুতবেগে ছুটে চলেছিলো জীবন। কেটে গেলো বছরের পর বছর। অনেক ধুলো উড়লো, ঘাম ঝরলো, কালি খরচ করলুম অজস্র, অনেক ছুটোছুটি, হৈ-চৈ—সব মিলে যে কিছু-একটা হ'য়ে উঠছে, সে-বিষয়ে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ ছিলুম। এই সমস্ত বছর ধ'রে যুদ্ধ করেছি—সব সময় তার দরকার ছিলো ব'লে নয়, তাতে আনন্দ ছিলো ব'লে, প্রতিষ্ঠা করেছি নিজের কীর্তি—কীর্তির লোভে ততটা নয়, সৃষ্টির, যে-কোনো সৃষ্টির উৎসাহে; অর্থোপার্জন করেছি, কেননা বাঁচতে হবে। বাইরে থেকে দেখতে গেলে, মোটের উপর, সংসারে অন্য দশ জনের জীবন যেমন কাটে আমারও তা-ই কেটেছে। উপভোগ করিনি, এমন বলবো না। অনেকটা সময়ই সুখের ছিলো না, কিন্তু প্রায় সব সময়েই ধার ছিলো। যুদ্ধে ছিলো মজা। চ'লে এসেছি ঝোঁকের মাথায় যতদূর সম্ভব; এখন বুঝতে পারছি, মেয়াদ ফুরিয়ে এলো। এতদিনে সময় হয়েছে থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখবার। এতদিনে বুঝেছি যে আমি যদি সমস্ত জীবন ফুলকপির চাষ ক'রে কাটিয়ে দিতুম, তাহ'লেও পৃথিবীটা যেদিন ধ্বংস হবার, সেদিনই হ'তো। এতটা হৈ-চৈ না-করলেও ক্ষতি ছিলো না। সবার বেশি, এত কালি না-ছিটোলেও পারতুম। এতদিন যুদ্ধ ক'রে জীবনের যে-গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেছি, তা যেন হঠাৎ বিকল হ'য়ে

গেছে। নিজেকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে, বড়ো ক্লান্ত। সময় থাকতে একটি স্ত্রী সংগ্রহ করা হয়নি; এই ক্লান্তি উপঢৌকন দিয়ে যে কারো কাছে বখশিষ আদায় ক'রে নেবো সান্ত্বনা, তার আর উপায় নেই। আমি একা, আমি স্বাধীন; যা খুশি তা-ই করবার কি না-করবার আমার কোনো বাধা নেই। অবসরের নিস্তরঙ্গ হ্রদের প্রশান্তির উপর যেদিক থেকে যেমন হাওয়া বইছে, আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। কোনো তাড়া নেই, নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। এত সময় আমার হাতে—কাজের লোকেদের দু'হাত ভ'রে মুঠি-মুঠি বিলিয়ে দিতুম, যদি পারতুম। মন বাইরে থেকে স'রে এসে ডুব দিয়েছে নিজের মধ্যে; সেখানে চলেছে বিস্মৃত অতীতের পুনরভিনয়। এলোমেলো, ছিন্ন-ভিন্ন। সমস্তটা একসঙ্গে গেঁথে গল্প সাজাবার যেটুকু উৎসাহ, তা-ও আর নেই আমার। সব গল্প লেখা হ'য়ে গেছে; এখন শুধু ঝিমোচ্ছি; ছবির পর অসংলগ্ন ছবি ভেসে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। ও-সব ছবি, ভেবেছিলুম, চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। কত তুচ্ছ কথা—কখনো ভাবিনি স্মৃতি সেগুলো জমিয়ে রাখবে। এদিকে আমার মস্ত কীর্তির রং আমারই চোখের সামনে ফ্যাকাশে হ'য়ে এলো। যাক, ও-সব শেষ হয় তো হোক। শেষ: এ-কথাটা বলতে পারাই একটা স্বস্তি। বিক্ষোভের, দুরাশার, ব্যর্থতার শেষ। আজ ইচ্ছে করছে, কালের অপেক্ষা না-রেখে নিজেই আমার সব কাজের উপর একটা কালির আঁচড় টেনে দিই। আজ চল্লিশ বছর পর আমার অপর্ণা-দিকে মনে পড়ছে।

ধূসর গোধূলি

চল্লিশ বছর পর! সময় ব'য়ে চলেছে বিরামহীন, দু'হাতে ছিটিয়ে যাচ্ছে আফিমের বীজ, মানুষের ঐশ্বর্যের উপর, আশার উপর, দম্ভের উপর ছড়িয়ে যাচ্ছে ধুলো। আফিম ফুলের নেশা, ঘুম, বিস্মৃতি। আমাদের উপস্থিত মুহূর্তের যত বুক-ধুকধুকানি, পাখা-ঝাপটানি; যত রাত জেগে-জেগে চোখের জল ফেলা, দিন ভ'রে অস্থির যত তাড়না—মুহূর্তের সঙ্গে মুহূর্তের আলোর সংযোজনায় আমাদের যে-দীর্ঘ, তিক্ত, বঙ্কিত পথ—তার শেষে, সবার শেষে সেই বিস্মৃতির কালো নদী, অতল নদী, তারাহীন রাত্রে অরণ্যের মতো অন্ধকার। সময়ের হাত এসে সব মুছে নেয়—আমাদের সব ইচ্ছা আর চিন্তা, আমাদের শক্তির উদ্দীপনা আর সংঘাতের বিক্ষোভ। শক্তির সচেতনতায় আর পরিচালনায় মত্ত, আমি কখনো ভাবিনি, অপর্ণা-দি আবার আমার জীবনে ফিরে আসবেন। ভেবেছিলুম, শেষ যা হয়েছে, চিরকালের মতোই হয়েছে—এর পর থেকে তার উপর শুধু স্তূপ হ'য়ে জমবে সময়ের ধুলো। তা-ই জানতুম। কিন্তু আশ্চর্য! তা-ই যে, দেখছি, আজ ফিরে এসেছে নতুন হ'য়ে—আমি ভেবেছিলুম, যা একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে, ভুলে' গিয়েছি। মনের কোন অবচেতন গুহায় তা লুকিয়ে ছিলো মাত্র—আজ যেই বাইরের আলোড়ন থেমে গেছে, জীবনে ধরেছে শান্ত-ধূসর রং অমনি সুযোগ পেয়ে জেগে উঠছে। একদিন মনে যে-সুর অস্পষ্ট হ'য়ে বেজেছিলো, আজ চল্লিশ বছর পর তারই প্রতিধ্বনিতে মুখর হ'য়ে উঠছে আমার সমস্ত সত্তা। তারই স্পর্শে আজ আমার

নিশীথের আকাশ সুরময়। মনে হয়, জীবনের দুই প্রান্ত যেন এক অবিচ্ছিন্ন সুর-সংগতি: মাঝখানকার চল্লিশ বছরই অবান্তর, প্রক্ষিপ্ত। এই চল্লিশ বছর যেন আগুনের মুখে শুকনো কাগজের মতো আমার চোখের উপর আস্তে-আস্তে কুঁকড়ে যাচ্ছে। হারিয়ে-যাওয়া যে-অতীত, তা-ই আজ আমার মধ্যে সবচেয়ে জীবিত। মধ্যবর্তী যে-কুয়াশা, সেটাই মোহ: আজ যেন মুহূর্তের এক অদ্ভুত জাদুতে তা কেটে গিয়ে স্পষ্ট আলো উঠলো জ্ব'লে। এতদিন যা নিয়ে এত হৈ-চৈ, এত যুদ্ধ, এত অশান্তি, সময়ের ধুলো এরই মধ্যে পড়তে আরম্ভ করেছে আমার সেই সব লেখারই উপর, কাজেরই উপর।

প্রত্যেক পুরুষের জীবনেই এমন-কোনো সময় আসে, যখন সে আশ্রয় চায়, হাত বাড়িয়ে পেতে চায় কারো স্পর্শ—যা তাকে আরাম দেবে, স্তুতি করবে, আড়াল ক'রে রাখবে তাকে প্রত্যক্ষ জীবনের তীক্ষ্ণতা থেকে। যে-স্পর্শ তাকে তখনকার মতো জাদু করবে, ঘুম পাড়াবে তাকে। কোনো মেয়ের হাতের সে-স্পর্শ, মেয়ের মধ্যে প্রিয়ার। এরই জন্য পুরুষের জীবনে স্ত্রীর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সে যে ঘটা ক'রে সেবা করবে, মিষ্টি ক'রে কথা বলবে, তা নয়: সে শুধু একবার ঠাণ্ডা হাত রাখবে কপালে, নরম দৃষ্টি একবার মেলে' ধরবে মুখের উপর। নীল ফুলের মতো সে-দৃষ্টি। শুনতে ভালো, মনে-মনে ছবি দেখতে ভালো, কিন্তু এই ব্যবস্থায় আমার অন্তর সায় দেয়নি কখনো। স্ত্রীলোককে আমি ভাবতে পারিনি আশ্রয়ের আশ্রম; ভিক্ষার হাত বাড়াবে

তাঁর দিকে, ঐ-চিন্তায় আমার ব্যক্তিত্ব অবমানিত হয়েছে। যাঁরা বলবেন, মেয়েরা সেবা করতেই ভালোবাসে, পুরুষের পালিয়ে আসবার আশ্রয়স্থল হ'য়েই জীবন ধন্য মানে, তাঁদের সঙ্গে আমি তর্ক করবো না; স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অল্পই। আমি শুধু নিজের কথা বলতে পারি এই যে মেয়েদের ও-রকম ক'রে ব্যবহার করা আমার স্বভাবের বিরুদ্ধ। এ যেন কাজের লোকের ছুটির দিনের বিরল বিলাসিতা—বাকি সময় ভুলে' থাকবার, আমলে না-আনবার। এ-রকম ভালোবাসা আমার কাছে বড়ো বেশি শৌখিন মনে হয়। আমাকে যদি কোনো মেয়েকে দেয়াই হ'তো ভালোবাসতে, তাকে দিয়ে আমি নিজের জন্য আড়াল রচনা করতুম না, কেননা সেই আড়ালে সে নিজেও যে থাকতো প্রচ্ছন্ন হ'য়ে। তাকে নিয়েই আমি দাঁড়াতুম জীবনের মুখোমুখি: ছায়া দিয়ে তাকে ঘিরে না-রেখে আঘাতসংকুল বহির্জগতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতুম তার সত্যকার রূপ।

তবু মনে হয়, অপর্ণা-দি থাকলে আজ তাঁর মধ্যে আমি আশ্রয় খুঁজতাম। আমার ক্লান্তির গভীরতা থেকে হাত বাড়াচ্ছি: শূন্য। অপর্ণা-দি থাকলে তাঁর নীল চোখের মায়া স্পর্শ করতো আমাকে; রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার তাঁর আকৃতি নিয়ে তারই যেন ইঙ্গিত করে। আর সেইজন্যই বোধহয় তাঁকে আমার এত বেশি ক'রে মনে পড়ছে। রাত যখন অনেক হয়, আকাশে তারাগুলি চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে, তারা থেকে, অন্ধকার থেকে, স্তব্ধতা থেকে কী-যেন সঞ্চারিত হয় আমার মনে,

বই সরিয়ে রেখে আমি উঠে দাঁড়াই, হয়তো একটু পাইচারি করি, জানলার কাছে গিয়ে নিশ্বাস ফেলি ঠাণ্ডা হাওয়ায়। মনে পড়ে অপর্ণা-দিকে; তাঁকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, তাঁর নীল চোখের নীরব প্রশ্ন, কপালের উপর লুটিয়ে-পড়া চুল। মনের একটা অদ্ভুত অবস্থা হয়; ঠিক শোক নয়, শোকেরই কোনো-একটা সূক্ষ্ম রূপান্তর—বুকের ভিতরটা থেকে-থেকে যেন ঈষৎ কেঁপে ওঠে—দুঃখে—না, না দুঃখে না, বরং যেন আনন্দে, যেন কোনো পরিপূর্ণতার প্রত্যাশায়। মধুর: সমস্ত রাত্রি আমার মধুর হ'য়ে ওঠে; অপর্ণা-দিকে মনে করতেও মধুর। সমস্ত মন চায় কথা ক'য়ে উঠতে। ইচ্ছে হয়, ল্যাণ্ডরের মতো ছোটো একটি কবিতায় খুব সহজ ক'রে বলি আমার এই মুহূর্তের মনের কথা, বেঁধে রাখি এই বিরহ-মধুরতাকে। কিন্তু বহুকাল কবিতা লেখার অভ্যেস নেই; সেই ক'টি লাইন বার-বার নিজের মনে আবৃত্তি ক'রেই তৃপ্ত থাকতে হয়—তৃপ্তি হয় না। অন্য-একজনের ভাষায় উচ্চারণ করি উৎসর্গ: 'অপর্ণা-দি, স্মৃতিতে আর দীর্ঘশ্বাসে ভরা এই একটি রাত্রি তোমাকে দিলুম।'

কিন্তু একটি যে নয়, রাত্রির পর রাত্রি; স্মৃতিতে ভরা, দীর্ঘশ্বাসে ভরা—সে-সময়কার অব্যক্ত কোনো বাসনার গুঞ্জরণে, তখনকার মতো পরাভূত কোনো অন্ধকার হতাশার প্রতিচ্ছায়ায় ভরা। স্বপ্ন, স্বপ্ন। জীবন ভ'রে যা-কিছু কুড়িয়েছি, গ'ড়ে তুলেছি ভীষণ পণে, ছিনিয়ে এনেছি খেয়ালি ভাগ্যের নখ থেকে, অন্ধকার রাত্রি আমার সেই সঞ্চয়ের উপর বিছিয়ে দিয়েছে

বিস্মৃতি : যেন কোনো রাসায়নিক সংযোগে তাকে যেই পরীক্ষা করা গেলো, অমনি বেরিয়ে পড়লো তার মৌল শূন্যতা। দেখা গেলো, স্বপ্ন ছাড়া কিছুই সত্য নয়; সেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'য়ে যা-কিছু টিঁকে রইলো, তা শুধু আমার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, নিজের শক্তির মোহে যাকে উপহাস করেছিলুম, উপেক্ষা করেছিলুম। স্বপ্ন, স্বপ্ন। জাগরণের স্বপ্ন থেকে ঘুমের স্বপ্ন। দিন থেকে রাত্রি। রাত প্রায় ভোর ক'রে যখন ঘুমোতে যাই, আমি ঠিক জানি, ঘুম একটা বিলুপ্তি আনবে না, আনবে না ছেদ : ঘুমের মধ্যেও অবিচ্ছিন্ন ব'য়ে চলবে আমার জীবন, যা এতদিনে মুক্ত হয়েছে অবান্তরতা থেকে, আবর্জনা থেকে, ফ'লে উঠেছে স্বপ্নের সোনায়।

স্বপ্ন দেখবার দুটো বয়স—এক : প্রথম যৌবন, সবে যখন রং ধরেছে, মন কাঁপছে থরথর ক'রে অস্পষ্ট প্রত্যাশায়। যেন একটা যন্ত্র তার অন্তর্নিহিত বিশাল-জটিল সুর-সৌধ নিয়ে প'ড়ে আছে, যেন একটা প্রদীপের শিখা উর্ধ্বমুখ হ'য়ে ধ্যান করছে আলোকে। নেই স্পর্শ, নেই আগুন। নেই, কিন্তু বেশি দেরিও নেই : যন্ত্রের সুরময় প্রাণ আকাশ ভ'রে বেজে উঠলো ব'লে; ফ'লে উঠলো ব'লে শিখার শূন্য মুখ আগুনের অঞ্জলিতে। গাছের সমস্ত শরীর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে প্রাণ; মাটির গভীর অন্ধকার থেকে রোদে-মেলে'-ধরা প্রতিটি ছোটো পাতায় বিস্তৃত প্রাণের সবুজ আগুন; নতুন যে-কুঁড়ি এইমাত্র দেখা দিলো, তার মধ্যে সেই শক্তিরই চরম স্ফুরণ। সেই কুঁড়িতে রয়েছে শতাব্দীর

ফুলের ঐশ্বর্য। আমাদের মনেও, তেমনি, নতুন এক চেতনার কলি ধরেছে, রক্তের মধ্যে সাড়া দিচ্ছে নতুন এক প্রাণের উৎসাহ। বিকাশ-উৎসুক সেই কুঁড়িতে জীবনের সব উত্তাপ আর সৌন্দর্য, হতাশার পটভূমিকায় আনন্দের অসংলগ্ন মুহূর্তগুলির বিদ্যুৎ-লীলা ; দীর্ঘ, মন্থর মৃত্যুর পরে প্রাণের চরম, জ্যোতি[illegible] পুনরুত্থান। সেই নতুন চেতনায় কত তুচ্ছ, ছোটোখাটো জিনিশের অন্তর্লীন গূঢ় ইঙ্গিত ধরা পড়ে ; এখানে একটু ভুরুর বাঁকা রেখা ; পথ দিয়ে যে-মেয়ে চলেছে, তার হঠাৎ-দেখা শাড়ির রং ; পরদার ওপারে চুড়ির একটু রিনিঝিনি ; কখনো বা আনমনে বলা ছোটো কোনো কথা, যা মনে থাকে সেই কথার জন্য নয়, বলবার সময় ঠোঁটের যে-সুন্দর ভঙ্গি হ'লো তার জন্য। এই সমস্ত জিনিশ, মনে হয়, যেন বিশ্বেরই অংশ ; যেন সূর্যই এত আলো দিয়েছে ঐ মেয়েটির হাসিতে, যেন সমস্ত সৃষ্টি ব্যর্থ হ'য়ে যেতো ঠিক ঐ সময়ে ঐ হাসিটুকু না-হ'লে। এই-সব ভাঙাচোরা টুকরো নিয়ে নবযৌবনের খেলা ; জোড়া লাগাবার চে[illegible] নেই, যেমন আছে তেমনি ; এলোমেলো, অগোছালো ; খেলা ভ[illegible]লো লাগে ব'লেই খেলা। উপকরণ যা-ই হোক, এসে যায় না ; আড়ালে আছে আকাশ-ভরা স্বপ্ন, আড়ালে আছে স্বপ্নভরা দৃষ্টি।

কিন্তু ক্রমে আমাদের আকাশ আসে ছোটো হ'য়ে, প্রকাণ্ড [illegible] দেখা দেয় যাকে আমরা—কী মূঢ়, কী অন্ধভাবে !—বলি ব[illegible]। বাস্তব !—মানে, বস্তুর রাশির পর রাশি, সঞ্চয়ের স্তূপের পর স্তূপ—আরো, আরো, আরো। চাই, চাই, চাই—সমস্ত অস্তিত্ব

একটা আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘ চীৎকার, লোভের দীনতা, দীনতার দম্ভ। চাই, চাই, চাই—আরো, আরো, আরো : এ-ই হচ্ছে সুর, যে-সুরে বেজে চলে জীবন ; যে-সুরে দিন আর রাত্রি কালের হাওয়ায় উড়ে যায়, ঝ'রে পড়ে। কুড়োনো গেলো পয়সা, ছড়ানো গেলো পয়সা : সবাই বললে, বাঁচলো বটে লোকটা ! বাঁচলো ! এদিকে আমরা ভুলে' গিয়েছি, বাঁচবার মানে কী। জীবনের সব চেতনা নিংড়ে বের ক'রে নেয়া হয়েছে আমাদের ভিতর থেকে, যাতে আমরা যোগ্য হ'তে পারি পয়সা কুড়োবার, পয়সা ওড়াবার। এরই নাম কৃতিত্ব।

সংসারে বেশির ভাগ লোকের জীবন এখানেই শেষ হয়। যাঁরা কৃতিত্বের চূড়ায়, তাঁদের নাম ওঠে খবর-কাগজে ; কেউ-কেউ বা স্কুলপাঠ্য বইয়ে লেখে তাঁদের জীবনচরিত। আর যা-ই হোক, সে-ফাঁড়া কেটে গিয়েছে আমার। যে-সব লোক বই লেখে, বালকদের চোখের সামনে আদর্শহিশেবে তাদের জীবন, সুখের বিষয়, ধরা হয় না। সব সময় সব দেশেই মানুষ লেখকদের দেখে এসেছে ঈষৎ সন্দেহের চোখে ; প্রশংসা করেছে, স্তুতি করেছে, এমনকি, বিরল কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ভালোও বেসেছে, কিন্তু ঠিক মেনে নিতে পারেনি। সরকারি খ্যাতির পাকা খাতায় তাদের নাম যদি বা উঠেছে, সেটা এতই দেরিতে যে তখন আর অনিষ্টের আশঙ্কা কী। আর সেই কারণেই আমি বেঁচে গেলুম ; বেঁচে গেলুম জীবনের যারা শত্রু তাদের হাত থেকে, সবচেয়ে বেশি

সংখ্যার সবচেয়ে বেশি মঙ্গলের চেষ্টায় দিন-দিন যারা পৃথিবীকে মানবজাতির বসবাসের অযোগ্য ক'রে তুলছে, তাদের হাত থেকে। স্রোত থেকে আমি স'রে দাঁড়াতে পারলুম : আমি একা, সময়ের অসীমতা আমার। এলোমেলোভাবে ফিরে আসছে আমার প্রথম যৌবন, স্মৃতি হ'য়ে ; যার মানে, সময়ের হাত লেগে মধুর হ'য়ে, কোমল হ'য়ে। তা নিয়ে আবার আমি খেলা করছি, ফাঁকগুলি তেমনি আবার ভরিয়ে তুলছি স্বপ্ন দিয়ে। ভাবতে ভালো লাগে ; সব কথা মনে পড়ে না, সে-জন্য আরো বেশি ভালো লাগে। এ-ই হচ্ছে স্বপ্নের আর-একটা সময়, বিকেলের হেলানো আলোয় ছায়াগুলি যখন দীর্ঘ দেখাচ্ছে, তখন শান্ত হ'য়ে ব'সে মনের ভাবনাগুলিকে যেমন খুশি মেলে দেয়া— তন্দ্রাময় সোনালি আলোয় আচ্ছন্ন, দীর্ঘ অলস এক অপরাহ্ণ কাটানো—হ্যাঁ, এ-ই তো সুখ, একরকমের শান্ত আনন্দ যা কিছুতেই নষ্ট হয় না, কলুষিত হয় না—তারই নাম হয়তো শান্তি। শান্তি, শান্তি। শান্তি—তা শুধু একটা নেতি নয়, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জোড়াতালি দেয়া একটা আপোশ নয় ; তা মনের একটা প্রবল অনুভূতি, তীব্র একটা অভিজ্ঞতা। মনের নানা বিরোধী শক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের, নিজের মধ্যে একটা অখণ্ডতার উপলব্ধি। সব শান্ত, বিকেল সোনালি, মুক্তা-স্বচ্ছ সমস্ত আবহাওয়াই যেন নর্তকীর বুকের কাঁচুলির মতো একটু-একটু কাঁপছে। ব'সে-ব'সে আমি অপর্ণা-দির কথা ভাবছি।

অপর্ণা-দি

১

অপর্ণা-দির মতো সুন্দর মানুষ আমার চোখে কখনো পড়েনি। বরং বলা উচিত, এত সুন্দর আমার চোখে আর-কাকেও লাগেনি, যতটা লেগেছিলো তাঁকে। তার একটা কারণ হ'তে পারে আমার সেই কাঁচা বয়স, যখন প্রথম তাঁকে দেখি। সে-বয়সে মন মুগ্ধ হবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই থাকে: বিশেষ ক'রে, স্ত্রীদেহের লাবণ্য সম্বন্ধে তার অনুভবশীলতা এত বেশি প্রখর থাকে যে সেটা একটা অস্বস্তির মতো। এটা ঠিক যে অপর্ণা-দিকে প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিলো যেন স্বপ্ন দেখছি। আমার কিশোর বয়সের সব অস্পষ্ট কল্পনা, যাতে আকাশ ভ'রে গিয়েছিলো; কাব্য থেকে, গল্প থেকে, নিজের মনের বিশাল নীহারিকামণ্ডল থেকে টুকরো-টুকরো সংগৃহীত, তখন পর্যন্ত নিজেরই কাছে দুর্বোধ্য বাসনার সোনা; সোনা-রঙিন কুঁড়িতে-কুঁড়িতে ঢেউ-তোলা চঞ্চলতার হাওয়া—এ-সবের, এ-সব-কিছুর, এ-সবের চেয়েও অনেক বেশি কিছুর শরীর, দৃশ্যমান মূর্তি, অপর্ণা-দিকে আমি দেখেছিলুম। তাঁর ছোটো নরম শরীর যেন নিজেকে ছাড়িয়ে মিশে গিয়েছিলো গহন রহস্যে—অন্তত আমার চোখে। আমি মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম; আমার অসহ্য লাগতো তাঁর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে, এত সুন্দর। তাঁর ঠোঁটের কোণে যখন ক্ষীণ হাসি খেলা করতো,

কি নীল ফুলের মতো তাঁর চোখ যখন ভ'রে যেতো নরম আলোয়, আমার মনে হ'তো আমার হৃৎপিণ্ড যেন চূর্ণ হ'য়ে যাবে। প্রথম দিন থেকেই আমার মন ছুটেছিলো তাঁর দিকে, মনে-মনে তাঁর নাম ক'রে আমি শপথ নিয়েছিলুম; নিজেকে আমি দিয়েদিলুম তাঁকে, স্বেচ্ছায়, তিনি তা চান কিনা, জানবার অপেক্ষা না-ক'রেই, পরিপূর্ণরূপে। আমার পূজাপ্রার্থী কৈশোর তাঁকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা ক'রে ধন্য হয়েছিলো।

তা ছাড়াও, আমার সেই নিতান্ত ব্যক্তিগত, নিজের মধ্যে সংগোপন সেই স্বপ্ন-মধুরতার কথা ছেড়ে দিলেও—সাধারণ বিচারে, নিরপেক্ষ বহির্দৃষ্টিতেও অপর্ণা-দির মতো সৌন্দর্য বিরল। আমি প্রায় ব'লে ফেলেছিলুম, রসেটির কথার প্রতিধ্বনি ক'রে, 'তাঁর মতো সৌন্দর্যকে প্রতিভা বলা যায়।' কেননা, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে, এ-ই তো ছুটো জিনিশ, সৌন্দর্য আর প্রতিভা, যার মুখোমুখি এলে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়, যেখানে স্তব্ধ হ'য়ে যায় আমাদের সব তর্ক আর পরীক্ষা, যা অবোধ্য, যা স্বয়ংসিদ্ধ, আমাদের মানুষের জীবনের সব অনুসন্ধান অতিক্রম ক'রে নিজের জ্যোতির্মণ্ডলে যা চরম। মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য বিরল, প্রতিভা বিরলতর: প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম-পালনে ও দুঃখ-গ্রহণে মানুষের যে-রূপের সঙ্গে আমরা অভস্ত্য, সেইটেকেই মনে-মনে একরকম মেনে নিয়ে নির্বিবাদে আমরা দিন-যাপন করি। তাই যদি কখনো—এবং যখনই—আমরা সংস্পর্শে আসি সৌন্দর্যের কি প্রতিভার, হঠাৎ যেন কেউ একটা প্রবল ধাক্কা দেয়, তীব্র

চমক লাগে মনে: জ্ব'লে ওঠে বিশাল, ভীষণ এক আলো, দৃষ্টি তার মধ্যে লীন হ'য়ে যায়। সেই আলোর মুখোমুখি, কার সাধ্য আছে উচ্চারণ করে প্রশ্ন, তাকে গ্রহণ ক'রে না নেয় অন্তরের সর্বস্ব ব্যাকুলতা দিয়ে? তাকে দিয়ে নিজের সমস্ত সত্তাকে পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে নিতে না চায়, এমন সাহস কার? সেই আলোর কাছে যে-গভীর, নিঃসংশয় আত্ম-সমর্পণ—সেটাই তো মর্ত্য-মেঘের প্রান্তে-প্রান্তে স্বর্গ-রেখা, তা দিয়েই তো আমরা প্রমাণ করি আমাদের সত্তার সত্য: তা-ই তো আমাদের পবিত্র করে, সংকীর্ণ সংসার থেকে ছিন্ন ক'রে নিয়ে যায় উর্ধ্বলোকে: আমাদের মধ্যে যা নিহিত, যা সম্ভাব্য, যা চরম, এর স্পর্শে তারই অঙ্গীকার—যজ্ঞের আগুনের মতো। যেন কবে, কোন অস্পষ্ট, সুদূর অতীতে নিজেরই কাছে এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—এ তারই স্মারক। অপর্ণা-দিকে দেখলে আমার মনে—আমার মনে হয় যে-কোনো লোকেরই মনে, যতই ক্ষীণ, যতই অবচেতনভাবে হোক—যে-কোনো লোকেরই মনে মর্মর তুলতো তার অন্য সত্তা, যা সে হ'তে পারে না, যা হ'তে সে চাইতে পারে মাত্র। কিন্তু সেই চাওয়াটাই যে হারিয়ে যায়, লুপ্ত হ'য়ে যায়, আমরা যে ভুলে' থাকি চাইতেই, জীবনের বেশির ভাগ সময়। সেটা মনে পড়ে, সেই চাওয়ার অন্ধকার উত্তাপে আমরা ভ'রে উঠি, যখন কাব্য কি সংগীতের বিদ্যুৎ-তীব্রতা আমাদের হৃৎপিণ্ডকে আঁকড়ে ধরে, যখন আমরা প্রতিভার স্বর শুনতে পাই, কি যখন অপর্ণা-দির মতো কেউ হঠাৎ ঝলসে ওঠে আমাদের দৃষ্টির সামনে।

অপর্ণা-দির গায়ের রঙে পাকা আঙুরের মতো ম্লান আভা ; সূর্যময়, রস-নিবিড় আঙুরের ম্লান, ম্লান আচ্ছাদন, যার ভিতর দিয়ে ছায়া ফেলেছে তাঁর উষ্ণ, মদির প্রাণ। এত পাৎলা, এত স্বচ্ছ যে তাঁকে স্পর্শ করা মনে হ'তো যেন অসম্ভব। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো উপলক্ষে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ধরিয়ে দিতো তাঁর মুখ, প্রকাশ ক'রে দিতো তাঁর নিহিত, জ্বলন্ত প্রাণ, লাল রক্তের মধ্যে সঞ্চারমাণ তাঁর আশা আর বাসনা, প্রতীক্ষা আর জল্পনা। তাঁর মনের ক্ষীণতম ভাবান্তর ফুটে উঠতো তাঁর মুখের সুন্দর রঙের উচ্ছ্বাসে। আর তাঁর বাঁকা-বাঁকা এলোমেলো কালো চুলগুলি এসে প'ড়ে থাকতো তাঁর রক্ত-উষ্ণ কপালে আর গালে—ভালোবাসায়, ভালোবাসার মূর্ছায়। যেন তাঁর গাল বড়ো বেশি ব'লে ফেলছে, কিছুই রাখতে পারছে না গোপন ক'রে—চুলগুলো তাই এসে লুটিয়ে পড়ছে, তবু যদি তাদের নিচে কিছু চাপা পড়ে। তাঁকে গোপন করতে, তাঁর গহন অন্তরকে গোপন করতে—স্থূল কৌতূহল থেকে, মূঢ়তার, দম্ভের আক্রমণ থেকে। আর তাঁর চোখ—তা যেন সব সময় চমকিত, শঙ্কিত, টলোমলো করছে তাতে যেন এক অজ্ঞাত, আশ্চর্য ভয়ের ছায়া, কোনো ছোটো নীল পাখির পাখা-ঝাপটানির মতো তার চঞ্চলতা। বড়ো-বড়ো, যেন অবাক হ'য়ে চুপ-ক'রে-তাকিয়ে-থাকা চোখ, ছোটো-ছোটো নীল আগুনের কণায় ভরা। ছোটো-ছোটো আগুনের কণা, জ্বলছে আর ঝলসাচ্ছে, যেমন [illegible]

ঝলসে যায় তারা থেকে তারায়—ভুরুর গর্বিত বাঁকা রেখার নিচে, ঈষৎ কেঁপে-কেঁপে ওঠা, দীর্ঘ পল্লবের আড়ালে—ছোটো-ছোটো আগুনের ফুলকি, হঠাৎ ছুটে-আসা ধারালো ফিনকি—বিদ্ধ ক'রে, অন্ধ ক'রে দিয়ে। সবসুদ্ধ, এক মস্ত, আশ্চর্য ফুলের মতো তাঁর শরীর—তা এত ম্লান আর ক্ষীণ, আর দেখতে এত ভঙ্গুর, রাত্রির কোনো আশ্চর্য ফুলের মতো, তারা-স্পন্দিত, উষ্ণ অন্ধকারে মাটি ফুঁড়ে যা ফুটে উঠেছে, মাটির তীব্র উত্তাপ-চাপে ম্লান, যার কোষে-কোষে অস্তমিত অদৃশ্য সূর্যের সঞ্চয়। নরম-উষ্ণ তাঁর ছোটো, আত্ম-সম্পূর্ণ শরীর, রাত্রির উষ্ণ ফুলের মতো ; ফুলের মতো স্তব্ধতায় ফুটে উঠে হঠাৎ যেন অন্তর্হিত হবার, বিলীন হ'য়ে যাবার। ভাবতে অবাক লাগতো, তিনি আমাদেরই পাঁচজনেরই মতো স্থায়ী, বাস্তব ; আমাদেরই মতো দিন থেকে দিন বেঁচে থাকার ভিতর দিয়ে নিজেকে অপচয় করছেন আর ক্ষয় : আমরা প্রায় আশা করতুম যে হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখবো, তিনি মিলিয়ে গিয়েছেন : আশ্চর্য রাত্রির ফুল তার অন্তর্লীন সূর্যকে, সূর্য-স্পর্শকে নিজের চারিদিকে পরিকীর্ণ ক'রে দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে ভূগর্ভের অন্ধকার গোপনতায় কি তারালোকের কোনো সুদূর জ্যোতির্মেঘে।

আমার মা বলতেন : 'ওকে দেখে আমার ভয় করে—এত সুন্দর যে, তার কপালে কখনো সুখ হয় না।' অপর্ণা-দি সম্বন্ধে আমাদের সবার মনেই ছিলো কেমন-যেন একটা ভয়—সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য এক ভয়, যে-জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বুকের

মধ্যে কোথায় মোচড় দিয়ে উঠতো—বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যেতো না। যেন তিনি অন্য-কোনো জগতের, অন্য-কোনো গ্রহের; যেন তিনি ঠিক আমাদের নন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে রহস্য, যার ভিতর দিয়ে তাঁকে আমরা সব সময় অস্পষ্ট দেখতুম। সব সময়, তিনি ঠিক আমাদের নাগালের বাইরে। তাঁর নিজের এক পৃথিবী, যার মধ্যে তিনি মগ্ন, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ। সেই পৃথিবী থেকে কখনো-কখনো হয়তো আসতো ইশারা আর মর্মর—আমাদের রক্তে লাগতো দোলা। ইশারা আর মর্মর—তার বেশি কিছু নয়। তার পরে অন্ধকার: রহস্যের অন্ধকার আর নীরবতা।

অপর্ণা-দির শরীরে ছিলো একটি সহজ শ্রী, যা কোনো প্রসাধনের, কোনো সজ্জার অপেক্ষা রাখতো না, বৃষ্টিস্নাত সবুজ নতুন শস্যের মতো যা সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত। তা যেন শুধু বলতো, 'আমি আছি'; আলোয় আর আবছায়ায়, দ্রুত-পরিবর্তনশীল ভঙ্গিতে আর ইঙ্গিতে,—'আমি আছি।' স্ত্রী-সৌন্দর্যের প্রচলিত রূপ নয়: চোখ-ধাঁধানো ঝলসানি, জমকালো বর্ণচ্ছটা—চোখকে যা আকর্ষণ করে, চোখকে যা মুগ্ধ করে, অন্ধ করে, যাকে স্তুতি করতেই হবে, আকাঙ্ক্ষা করতেই হবে: পুরুষের বিহ্বল দৃষ্টির নিচে নিজকে বিছিয়ে দিতে না-পারলে যা নিস্ফল, পুরুষের বাসনার উদ্দীপনায় যার পরিপূর্ণতা। না, সে-রকম নয়। বরং, তাঁর সৌন্দর্য যেন নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র একটা সত্তা—যা অন্যের সঙ্গে, বাইরের কোনো-কিছুর সঙ্গে সংস্পর্শ খোঁজে না; শান্ত,

শান্তভাবে যা বিচ্ছিন্ন, নিজের মধ্যে মগ্ন ও তৃপ্ত, মাতৃগর্ভের অন্ধকারে অজাত শিশুর মতো তৃপ্ত। তাঁর মধ্যে একটা মূলগত, মজ্জাগত নিঃসঙ্গতা ছিলো, একটা দূরত্ব—যা অন্য-কোনো উপস্থিতিকে আকাঙ্ক্ষা করবে না, স্বীকার করবে না। আর সেই দূরত্বের সবচেয়ে বেশি ব্যঞ্জনা তাঁর হাসিতে, ঠোঁটের এক কোণে অস্পষ্ট-ঝিলিমিলি তাঁর হাসি। এখনো সে-হাসি আমি মনে করতে পারি, যেন তাঁর মুখ আমার সামনে। ক্ষীণ, ক্ষীণ হাসি, এতটুকু বাঁকা রেখা, এককণা চাঁদের মতো। চাঁদের মতোই যেন তা সব জানে। সব জানে ব'লেই এত ক্লান্তি। হয়তো তাতে একটু কৌতুকের ছটা; ক্ষণিক বিদ্রূপের আভাস হঠাৎ ছুটে-আসা আলোর তীরের মতো। কিন্তু তার চেয়ে বেশি, সবচেয়ে বেশি—তখন আমার তা-ই মনে হয়েছিলো—ক্লান্তি, চাঁদের ক্লান্তি, চাঁদ-মধুরতায় ভরা। জীবনকে যেন তিনি বহন করতে পারছেন না; যেন ছেলেবেলা থেকেই জীবন তাঁর পক্ষে বড়ো বেশি, বড়ো বেশি। জীবনের যে-দীর্ঘ দুঃখের দিন প্রত্যাসন্ন, তার সচেতনতা যেন আগে থেকেই তাঁর মধ্যে ছিলো। এখনো যে-দীর্ঘ দিন প'ড়ে রয়েছে সামনে, তাঁর চিন্তাতেই যেন তিনি ক্লান্ত। আর সেই ক্লান্তি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাঁদ-হাসিতে।

আমার কাকা ব্রজমোহন জীবন কাটিয়েছিলেন আসামে। লেখাপড়া তিনি বেশি শেখেননি; তাঁর স্বভাবেও শৃঙ্খলা ছিলো না। ছিলো খাঁটি পূর্ববঙ্গের দুঃসাহস—সেই চাঞ্চল্য আর কল্পনা-প্রবণতা। প্রথম যৌবনে তিনি অনেকগুলি ছোটোখাটো

চাকরি করবার চেষ্টা করেছিলেন—ফল হয়েছিলো তাঁর নিজের ও নিয়োগকারীদের যথাসম্ভব অস্বস্তি। সে-সময়ে আসামের উপর বঙ্গসন্তানের সবে চোখ পড়তে আরম্ভ করেছে; নতুন দেশ, অকর্ষিত ভূমি—স্বপ্ন গ'ড়ে উঠলো সহজসাধ্য ভাগ্যের। ব্রজমোহন সে-সুযোগ ছাড়লেন না; তিনি ভেসে পড়লেন। সেখানে প্রথম কয়েক বছর কালাজ্বর আর পাইথনের মধ্যে সদ্য-সভ্যতা-স্পৃষ্ট জঙ্গলভূমিতে ঘুরে-ঘুরে তিনি কী করেছিলেন, ভাগ্যকে কী ক'রে সাধনা করেছিলেন, তা আমি জানি না। নিশ্চয়ই সে-গল্প খুব আশ্চর্য হবে, লিখতে গেলে; না কি, তা সেই প্রচলিত গতানুগতিক গল্প—নিষ্কপর্দক ছেলের লক্ষপতি হবার একঘেয়ে, বিরস কাহিনী। কারণ ব্রজমোহন, ঠিক লক্ষপতি না হ'লেও, যাকে বলে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন: শিলঙে আর গৌহাটিতে তাঁর বিলিতি রশদ আর মদের দোকানের বলতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না; শিবসাগর জেলায় একটা চায়ের বাগানের তিনি ছিলেন বারো আনা মালিক; আসামি সিল্ক কলকাতার বাজারে চালান দিয়েও তাঁর মোটা মুনফা থাকতো—যদিও সেটাকে তিনি গণ্যই করতেন না, বলতে গেলে। তিনি আরম্ভ করেছিলেন, যদ্দুর জানা যায়, চায়ের সাহেবদের এক ক্লাবের কেরানি-হিশেবে: প্রতি শনিবার সকালে কুড়ি মাইল দূরে রেল-ইস্টিশানে সাইকেলে ক'রে গিয়ে তাঁকে গোরুর গাড়ি ক'রে কলকাতা থেকে আগত মদের আর রশদের ঝুড়ি নিয়ে আসতে হ'তো। ফিরতে-ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা; সারাটা

দিন থাকতে হ'তো উপোসি। কষ্ট হ'তো। কিন্তু সে-কষ্ট গায়েই মাখতেন না তিনি; বস্তুত, কোনো কষ্টই গায়ে মাখতেন না। এমনও বলা যায়, কষ্ট করতে না-পারলেই তাঁর কষ্ট হতো। জীবনে কখনো আরাম করেননি তিনি; নিজের শরীরটাকে দয়া করেননি মুহূর্তের জন্য। তা যদি করতেন, তাহ'লে যা-কিছু তিনি হয়েছিলেন, তা হ'তে পারতেন কিনা সন্দেহ। সরকারিভাবে, তিনি থাকতেন তাঁর গৌহাটির বাড়িতে: মানে, সেখানে তাঁর পরিবার থাকতো—তাঁর স্ত্রী, এক মেয়ে, দুই ছেলে, আর দু'জন মাত্র চাকর (কারণ, বাবুগিরি তাঁর অপছন্দ)। নিজে তিনি বেশির ভাগ সময় বাইরে-বাইরেই থাকতেন; এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতেন কী ক'রে ব্যবসাকে আরো বাড়ানো যায়, সেই চেষ্টায়; কী করলে টাকার ফেরে আরো বেশি টাকা আসে, সেই সন্ধানে; তারপর হঠাৎ একদিন ঝুপ ক'রে এসে উপস্থিত হতেন বাড়িতে—দিন দুই একটু ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আর স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে হৈ-চৈ করতেন, তারপর আবার অদৃশ্য হ'য়ে যেতেন তাঁর ব্যবসার ঘূর্ণিতে, টাকার অন্ধকার কারখানায়। তাঁর পরিবারের কেউ তাঁর প্রতি বিশেষ-কোনো প্রাধান্য আরোপ করতো না, চাকর দু'জনও না। বাড়িটা তাঁর যথাস্থান নয়, তিনি বাইরের একজন: দিন কয়েকের জন্য তাঁকে সহ্য করা হ'তো মাত্র। এবং, তাঁর পরিবারের আর তাঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত লজ্জার ভাব ছিলো: তাঁর স্ত্রী কি ছেলেমেয়ে কেউ তাঁর কাছে ঠিক স্বচ্ছন্দ বোধ করতো না, কারো

সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হ'তে পারেনি তাঁর। সাধারণত, তাঁকে মনে কর হ'তো এক অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য শক্তি, যা দিয়ে অর্থ উৎপাদিত হয় টাকাটা. নীরবে গৃহীত ও ব্যয়িত হ'তো; টাকার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকেও ধ'রে নেয়া হ'তো আরকি। তাঁর স্ত্রীর কাছেও তিনি অনেকটা অচেনা লোক: স্বামী-সান্নিধ্যে স্ত্রী যেন সংকুচিত আড়ষ্ট, আধখানা মাত্র মানুষ। অবশ্য এ-সব জিনিশ ব্রজমোহন লক্ষ্য করতেন না; আর লক্ষ্য করলেও দুশ্চিন্তা করতেন না তা নিয়ে; নিষ্ফলা দুশ্চিন্তার অভ্যেস অনেককাল বর্জন করেছিলেন তিনি। বিয়ে তিনি করেন দেশে থাকতেই, আর বিয়ের পর দু' বছর স্ত্রীর সঙ্গে উদ্দাম প্রণয় করেন। অপর্ণা-টি তারই প্রথম ফল। তাঁর দ্বিতীয় ছেলেটির জন্ম হয় আসামে তার বড়ো ভাইয়ের ছ' বছর পর। আর দ্বিতীয় ছেলের জন্মের পর থেকে স্ত্রীর দিকে মন দেবার কথা ব্রজমোহনের আর মনেই পড়ে না, তার সময়ই বা কোথায়—মাঝে-মাঝে স্বামীর কর্তব্য করেন শুধু তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে, একটু উৎকটরকমেরই উৎকণ্ঠা।

ব্রজমোহন এই ভাবে তাঁর জীবন কাটিয়ে গিয়েছিলেন—ঝোপের মতো ঘন ভুরুওলা মোটা মজবুত মানুষ, মাথার মাঝখানে গোল টাক, চওড়া, ঢালু কপাল—আর উচ্চ, একটু কর্কশ কণ্ঠস্বর। এই, আমি তাঁকে যেমন দেখেছি। গোল আর বড়ো নাসারন্ধ্রের নিচে পাৎলা ক'রে ছাঁটা গোঁফ, পুরু নিচের ঠোঁট যেন একগুঁয়েমিতে উপরের ঠোঁটের সঙ্গে লেগে রয়েছে।

ছোটো-ছোটো তীক্ষ্ণ, অশান্ত চোখ তাঁর অশান্ত, সব-সময়-ব্যস্ত মনের ছবি। মাথা সব সময় প্ল্যানে ঠাশা—দ্রুতস্বরে, হঠাৎ থেমে-থেমে তিনি সে-সব উদঘাটন করতেন আমার বাবার কানে। আমি তাঁকে শেষ যেবার দেখি, সেবার তিনি একটা সিনেমা-গৃহ খোলবার জল্পনা করেছিলেন গৌহাটিতে। সে-জন্য জায়গা কেনা আর অন্য সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছিলো; কিন্তু হঠাৎ ম'রে গিয়ে নিজেই নষ্ট করে দিলেন এই একটা প্ল্যান। তিনি যথেষ্ট ক'রে গিয়েছেন, লোকে বলাবলি করলো। যথেষ্ট, তিনি নিজেও বোধহয় শেষ মুহূর্তে তা-ই ভেবেছিলেন; যথেষ্ট—ঐ ছবিঘরটা ছাড়া।

ব্রজমোহনকে আমি সহজে অপর্ণা-দির বাবা ব'লে কল্পনা করতে পারিনি, আজও পারি না। কোনো মিল নেই। সেই শক্ত, স্থূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর অপর্ণা-দির শরীরের স্বপ্নময় অবাস্তবতা যে একই রক্ত মাংস, এটা আমার বরাবর ঠাট্টার মতো লেগেছে। অপর্ণা-দি যে তাঁর মা-র কিছু পেয়েছিলেন, তা-ও নয়। আমার কাকিমা সেই ধরনের মেয়ে, বিয়ের ঠিক আগে যাঁরা দেখতে বেশ লোভনীয় থাকেন, আর বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই নেতিয়ে পড়েন, শুকিয়ে যান, ফিকে হ'য়ে যান। একটুখানি সময়ের জন্য তাঁরা একবার শুধু জ্'লে ওঠেন, তা না-হ'লে জৈব উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। এই দম্পতির মিলনে যে অপর্ণা-দির মতো মেয়ের সৃষ্টি হবে, একমাত্র মেণ্ডেলের থিওরির সাহায্যেই এ-ব্যাপারটাকে বোঝা যায়, বোঝাবার চেষ্টা করা যায়। অনেক দূর অতীতের,

অনেক-কাল-বিস্মৃত কোনো পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার হঠাৎ একলাফে মধ্যবর্তী অনেকগুলো বংশ পার হ'য়ে এসে অপর্ণা-দির মধ্যে লীলায়িত হয়েছে, এ ছাড়া আর-কোনো মীমাংসা এর হ'তে পারে না। অপর্ণা-দির দু' ভাই—তারাও একটুও তার মতো ছিলো না।

হঠাৎ একদিন ব্রজমোহনের খেয়াল হ'লো, মেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছে—এইবার বিয়ের চেষ্টা করতে হয়। সাধারণত, অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাঁর মন বড়ো বেশি ব্যাপৃত থাকতো—এত বেশি যে এদিক-ওদিক তাকাবার সময় পেতেন না। যাদের জন্য তাঁর অর্থানুধাবন, তাদেরই তিনি ভুলে' থাকতেন বেশির ভাগ সময়—অতি অনায়াসে। কিন্তু ঠিক তাদের জন্য বোধহয় নয়; তাঁর যে-মেজাজ, তাতে অর্থেই অর্থের পরিসমাপ্তি ও সার্থকতা। অর্থোপার্জনের জন্য বাইরের কোনো অনুপ্রেরণার তাঁর প্রয়োজন ছিলো না। সেই উদ্দেশ্যই নতুন কোনো ফন্দি, অপূর্ব কোনো উদ্ভাবনার অবসরে হঠাৎ হয়তো এক সময়ে তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছিলো মেয়ের কথা। অপর্ণা বড়ো হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে। যে-মুহূর্তে ভাবা, সেই মুহূর্তেই তাঁকে কিছু করতে হবে। ঐ ছিলো তাঁর স্বভাব: ঝোঁকের মাথায় তিনি কাজ করতেন, তাত জুড়োতে দিতেন না। ব্যবসাতেও তাঁর তা-ই প্রণালী দূরদর্শিতা, স্থির, মন্থর বিবেচনা, সাবধানী বিচক্ষণতা—এ-সব গুণের জন্য তিনি ব্যবসায় বড়ো হননি। ঝট ক'রে তিনি যা ক'রে ফেলতে না পারতেন, তা তাঁর করাই হ'তো না। কোনো

পরিকল্পনার দ্রুত সম্পাদনার প্রতিভা ছিলো তাঁর অসামান্য। তাঁর কল্পনায় ছিলো সাহস—তা-ই তিনি প্রয়োগ করতেন ব্যবসায়। অনেক সময় লোকশান হ'তো; তা নিয়ে বিলাপ ক'রে সময় নষ্ট করতেন না; তাঁর কল্পনা তখনই ধাবিত হ'তো অপরীক্ষিত কোনো রাস্তায়। সময় নেই; ভাববার, দুঃখ করবার জন্য থমকে দাঁড়াবার সময় নেই। যা করবার ক'রে তো নিই—এখনই, এই মুহূর্তে; তারপর—তারপর যা হবে, উপস্থিত মুহূর্তে তা তো দেখতে পাচ্ছি না আমরা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে-জন্য। তাতে অনেক সহজ হয় জীবন।

২

আমার বাবা সূর্যমোহন একটানা কুড়ি বছর কলকাতার এক তখনকার দিনে বিখ্যাত বেসরকারি কলেজে ইংরিজির অধ্যাপনা ক'রে ভালো ক'রে চল্লিশ পার হবার আগেই মারা যান। তিনি ছিলেন সেকেলে অধ্যাপক—মানে কুড়ি বছর বয়সে এম. এ. পাশ ক'রে অনায়াসলভ্য ডেপুটিগিরি প্রত্যাখ্যান ক'রে কেবল নিজেরই রুচির গরজে তিনি কাজ নেন কলেজে—এবং আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে তাতেই শিকড় গজিয়ে বসেন। সেখান থেকে নড়বার ক্ষীণতম ইচ্ছা তাঁর কখনো হয়নি; 'উন্নতি' করবার এতটুকু উদ্যম কি স্পৃহা ছিলো না তাঁর। এ-কথা বললে আজকালকার দিনে অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে তাঁর কাজকে তিনি ব্যবসা মনে করতেন না—নোট আর পাঠ্যকেতাব লিখে, পরীক্ষার খাতা দেখে, টিউশনি ক'রে, বইয়ের দোকান খুলে—আরো যে-সব উপায়ে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোটো-বড়ো দেবতারা প্রভূত ধনাগমের ব্যবস্থা করেন—সে-সব তখন জানাই ছিলো না অধ্যাপক মহলে, জীবন-সংগ্রামও এত তীব্র ছিলো না। আমার বাবার মধ্যে, অন্তত, যে-কোনো উপায়ে আয় বাড়াবার কোনো চেষ্টাই দেখিনি, কোনো উপায়েই । মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর মাস-মাইনে অতি কষ্টে দুশোর কাছাকাছি পৌঁচেছিলো; আমরা ছিলাম দরিদ্র ভদ্রতায় পরিতৃপ্ত।

শান্ত ছিলো আমাদের জীবন—যেন ঘাসের উপর ব'সে পুকুরের সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কাটিয়ে-দেয়া বিকেলবেলা। তাড়া নেই, আওয়াজ নেই। ছোটো পরিবার—আমার আর-কোনো ভাই-বোন ছিলো না—বাড়িটা আশ্চর্যরকম চুপচাপ। যেন কাচের বাড়িতে বাস করছি, বাইরের কোনো শব্দ এসে পৌঁচচ্ছে না। সমস্ত শান্ত, আর ধীর, আর নিখুঁত-রকম গুছোনো। আমাদের প্রয়োজন ছিলো কম, আত্মীয়-বন্ধু ছিলো কম, সময়ের উপর দাবি ছিলো কম। বছরে একটা নিমন্ত্রণেও আমরা যেতুম কিনা সন্দেহ। আমার উপর কোনো নিয়মের শাসন ছিলো না, একা বাড়িতে ব'সে-ব'সে যা-খুশি করতুম, যা-খুশি পড়তুম। আমোদের উপকরণ আমার সামান্যই ছিলো; শিশুকালে যথেষ্ট পরিমাণে খেলনা পর্যন্ত ছিলো না। অবশ্য, সে-জন্য কোনো অভাববোধও ছিলো না আমার: কারণ আমার উদ্দাম কল্পনা যে-সব অদ্ভুত, অপরূপ খেলনা প্রতিদিন নতুন-নতুন আমাকে এনে দিতো, জর্মান কারখানার সবচেয়ে দামি উদ্ভাবনা তার কাছে ম্লানতায় মিলিয়ে যায়। আর আমার সেই কল্পনা আরো উত্তেজিত, আরো বিস্তৃত হ'তে পেরেছিলো উচ্ছৃঙ্খল, এলোমেলো বই প'ড়ে-প'ড়ে। নিঃসঙ্গতায় অভ্যস্ত, সেই কল্পনার মধ্যে আমি বাঁচতুম। আমার শরীর ছিলো দুর্বল, স্বভাব ছিলো ভীরু, সমবয়সীদের সঙ্গে ভালো ক'রে মিশতে পারতুম না, যোগ দিতে পারতুম না দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলোয়। সে-সময়কার কথা ভাবলেই বাবার চুরুটের গন্ধ আর মা-র ঘরের

ধূপকাঠির গন্ধে মিশে একটা মোহের মতো মনে এসে লাগে; আস্তে-আস্তে ফোঁটার পর স্বচ্ছ জলের ফোঁটা, আমাদের দিনগুলো কেটে যেতো। আমার সমস্ত বাল্যকাল কেটেছে এই নিঃসঙ্গতার সম্মোহনে, তারপর, আমার বয়েস যখন তেরো, অপর্ণা দি হঠাৎ আমাদের মধ্যে এসে আবির্ভূত হলেন।

আমাদের কাচের বাড়িতে, আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর, খানিকটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো একদিন ব্রজমোহন এসে ঢুকলেন। নিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে বাইরের জগতের অশান্তি আর কলরোল আর তাঁর পিছন-পিছন, যেন চুলে ধ'রে টেনে, ত্রস্তদৃষ্টি, রাত্রির কোনো গোপন ফুলের মতো ম্লান, তাঁর ষোলো বছরের মেয়েকে। আগে একটা খবর পর্যন্ত নেই। দূর থেকে, অস্পষ্টভাবে, আসামের পাইন আর পাইথনের পটভূমিকায় আমি তাঁদের কথা শুনেছিলুম। কাব্যের কোনো চরিত্রের মতো, অর্ধ-বিস্মৃত কোনো রহস্যময় উপাখ্যানের মতো। আর এমন আকস্মিকরূপে, এত কাছে থেকে, আমাদের মাঝখানে তাঁদের দেখা—ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় নিলো।

ব্রজমোহনের উচ্চস্বরে, উচ্চহাসিতে, অপর্যাপ্ত প্রগল্‌ভতায় আমাদের বাড়ির মুক্তা-নিটোল বায়ুমণ্ডল যেন চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেলো। এই তিনি রান্নাঘরে ঢুকে মা-র কাছে কলকাতার মাছের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ও উক্ত মৎস্যের বিভিন্ন রন্ধন-প্রণালী নিয়ে গবেষণা করছেন; এই তিনি দোতলার কোণের ছোটো ঘরে কোনো অপদেবতার দূতের মতো আবির্ভূত

দিয়ে টলস্টয়ের 'সংগ্রাম ও শান্তি'তে নিমগ্ন বাবাকে কী ক'রে এই আয়ের মধ্যেই অন্যান্য খরচ কমিয়ে আস্তে-আস্তে ছোটো-খাটো একটি বাড়ি করা যায়, সে-বিষয়ে উপদেশ দিয়ে আসছেন। তাঁর অসংযত ঝোড়ো প্রকৃতি নিজের চারিদিকে একটা হৈ-চৈ সৃষ্টি না-ক'রে টিঁকতে পারতো না। ছেলেমানুষ আমিও তাঁর নজর এড়াইনি —আমার সঙ্গেও তিনি সেই সব বিষয়ে আলাপে প্রবৃত্ত, ছোটো ছেলেরা যে-সব বিষয়ে উৎসাহী ব'লে প্রবাদ। স্নেহের কোনো আকস্মিক উদ্বেলতায় তিনি হয়তো আমাকে তাঁর বুকের উপর শক্ত ক'রে জাপটে ধ'রে গালের উপর কয়েকবার সশব্দে চুম্বন করতেন। ভীত, আমি কোনোরকমে তাঁর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেছি দূরে—পারতপক্ষে আর কাছে ঘেঁষিনি। আমাদের বাড়িতে স্নেহের এ-রকম উন্মুক্ত প্রদর্শনীর প্রচলন ছিলো না।

দু' ভাইয়ের চরিত্রে এমন বৈপরীত্য যে হঠাৎ দেখলে অবাক লাগে। মনে হয় দু'জনে যেন দু' দেবতার তৈরি। কিন্তু হয়তো শেষ পর্যন্ত, দু' জনের ভিতরের আসল বস্তুটা একই : যে-শক্তি কাকাবাবুর মধ্যে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছিলো নানা কর্মের উদ্যমে, সংকল্পের নির্মাণে, সেই শক্তিই আমার বাবার মধ্যে নিহিত হ'য়ে ছিলো জল্পনায়, চিন্তার নিবিড়তায়। কাকাবাবুর যে-কল্পনাপ্রবণতা কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত, বাবার মধ্যে তা মুক্তি পেয়েছিলো নিজেরই সত্তার ব্যাপ্তিতে। ব্যবসায় যে-দুঃসাহসের জোরে কাকাবাবু জয় করেছিলেন তাঁর ভাগ্যকে, বাবার সেই

দুঃসাহস চিন্তায়, মনের বেড়া ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে দিগন্ত থেকে আরো দূর দিগন্তের অনুধাবনে।

আশ্চর্য নয়, কাকাবাবু যে বাবাকে নিঃসংকোচে এবং প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করবেন। বাবা ছিলেন তাঁর মতে সেই জাতের মানুষদের একজন, যাদের 'কোনোকালেও কিছু হবে না।' 'হওয়া' অর্থে তিনি বুঝতেন একমাত্র টাকা। আর এত লেখাপড়া ইত্যাদি শিখে যে-লোক এতদিনে কলকাতায় সামান্য একটা বাড়ি পর্যন্ত করতে পারলো না…না, কাকাবাবু অকপটে, উচ্চস্বরে বাবার মুখের উপর হেসে উঠতেন। স্পষ্টত উপভোগ করতেন তাঁর অতীতের কাহিনী বলতে—কী ক'রে, ব্যবসার কোন ফিকিরে, তাঁর কোন মুরুব্বি সাহেবের কৃপায়, চতুরতার কোন আশ্চর্য অনুপ্রেরণায়—কী ক'রে আস্তে-আস্তে তাঁর এই সম্প্রতি-জাজ্বল্যমান ভাগ্য তিনি গ'ড়ে তুলেছেন। তাঁর ভাগ্য সম্বন্ধে যথোচিত গর্ব ছিলো তাঁর মনে।

তবু মনে-মনে তাঁর নিতান্ত অকর্মণ্য দাদার প্রতি গোপন একটু সম্ভ্রমও বুঝি ছিলো—তাই তো কাজের ফাঁকে হঠাৎ যেই বুঝলেন যে কন্যা প্রায় বিবাহযোগ্যা, অমনি তাকে নিয়ে ছুটে এলেন কলকাতায়—কেননা আসামের জঙ্গল যদি বা তার বুক চিরে উপঢৌকন দেয় লুকোনো সোনা, কন্যার উপযোগী একটি পাত্রের সন্ধান মিলবে না সেখানে। সে-বিষয়ে, তাছাড়া, তাঁর দাদার নির্বাচনের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিলো কুসংস্কারের মতো অন্ধ। মানুষের সমাজে, সামাজিক আচরণের নানা সূক্ষ্ম জটিলতায়

ব্রজমোহন ছিলেন শিশুর মতো অক্ষম। তিনি তা জানতেনও। তাঁর ঠিক মনের মতো পরিবেশ ছিলো অঙ্গন নয়, জঙ্গল; তাঁর স্বাভাবিক নেতৃত্ব পরিজনের পরিমণ্ডলে নয়, মহাজনের মহলে। তিনি জাজ্বল্যমান সেখানেই, সম্বন্ধ যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, দোকানির সঙ্গে খদ্দেরের। নাগরিকতায়, সভ্যতায়, মনের সঙ্গে মনের বিনিময়ে তিনি অত্যন্ত অসংগত, নিতান্ত নিস্ফল। মেয়ের বিয়ের জন্য, তাই, অনায়াসে, অন্ধ আস্থায় তিনি নির্ভর করলেন অর্থোপার্জনে অকৃতী তাঁর দাদার উপর। ও-সব তিনি জানেন, ও সব তিনি বোঝেন : তবে আর ভাবনা কী। যেমন নিজের বাড়িতে মাঝে-মাঝে ছেলেদের জন্য প্রাইভেট টিউটর রেখে দিয়ে আর স্ত্রীর জন্য বাড়তি কয়েক শিশি পেটেন্ট ওষুধ কিনে দিয়ে প্রসন্ন বিবেক নিয়ে আবার তিনি বেরিয়ে পড়তেন ভাগ্যের সমুদ্রে নতুন কোনো জাল ফেলতে, তেমনি মেয়েকে দাদার কাছে কলকাতায় পৌঁছিয়ে দিয়েই পিতার একটা বৃহৎ কর্তব্য সম্পন্ন হ'লো ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

এসে যেদিন পৌঁছলেন, সেই রাতেই খাওয়ার পরে—আমরা সবাই বারান্দায় পাটি পেতে বসেছি—তিনি বললেন :

'অপর্ণা তোমার এখানেই থাকবে, দাদা।'

বাবা বললেন : 'এটা যদি আগে ভাবতে, তাহ'লে মেয়েটা মানুষ হ'তে পারতো।'

'মেয়ে আবার মানুষ হবে কী? বিয়ে হবে—ব্যস!'

'তা বিয়ের এখনই কী ?'

'বাঃ, সেইজন্যই তো ওকে নিয়ে এলুম এখানে। বৌদি, তুমি একটু খোঁজ কোরো—যদি সুপাত্র পাওয়া যায় তো দেরি না। টাকা যা লাগে লাগবে।'

বাবা গম্ভীর হলেন। তিনি বড়ো হয়েছিলেন ভিক্টরীয় উদারনীতির আওতায়। মেয়েদের শিক্ষা না-দিয়ে অশোভন তৎপরতায় বিয়ে দিয়ে ফেলে' আমরা-যে দেশের সর্বাঙ্গীণ বিনাশের সহায়তা করছি, এ-কথা মনে-প্রাণে তিনি বিশ্বাস করতেন। 'এখনই মেয়েটাকে বলি দেবে!' একটু রূঢ় শব্দ প্রয়োগ ক'রে বললেন।

কাকাবাবু মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠলেন। বাবার কথা একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে মা-কে বললেন, 'তোমার উপরই ভার রইলো, বৌদি: তোমার তো মেয়ে নেই—অপর্ণাকেই মনে ক'রে নাও তোমার।'

মা বললেন, 'সত্যি তো' এমন তাড়াই বা কিসের। যাক না কিছুদিন।'

'ওকে ভালো একটা স্কুলে ভরতি ক'রে দিই', বাবা বললেন।

'এখন আর স্কুলে দিয়ে কী হবে। পুরুষমানুষ বইয়ের পাতার গন্ধ চায় না, চায় রূপ। রূপ ওর আছে।' কাকাবাবু এমন বেপরোয়া,নির্জলাভাবে কথাটা বললেন যে আমার কানে পর্যন্ত তা একটু বেসুরো ঠেকলো।

অপর্ণা-দি এতক্ষণ মাথা নিচু ক'রে পাটির উপর নখের আঁচড় কাটছিলেন, এইবার তাঁর মুখে গোলাপি আভা ছড়িয়ে

পড়লো। তা গোপন করবার জন্য আরো বেশি নিচু করলেন মাথা।

বাবা গভীরভাবে আচ্ছন্ন অনুজ-নিন্দিত বইয়ের পাতারই গন্ধে: অন্যদিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন। কথাটা সেখানেই চাপা পড়লো—এবং শেষ হ'লো। ব্রজমোহন যে-ক'দিন কলকাতায় ছিলেন, ও-প্রসঙ্গ আর কখনো উল্লেখ করেননি—সব ঠিক হ'য়ে গেছে, এই নিশ্চিন্ততায় বোধহয় ভুলে'ই ছিলেন কথাটা। তিনি সব সময় উপস্থিত মুহূর্ত নিয়ে বাঁচতেন—যে-কোনো বিষয়ে, যেটুকু না-ভাবলেই নয়, তার বেশি কখনো ভাবতেন না। দ্বিধা, জল্পনা, ভাবনার সুতো ধ'রে-ধ'রে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়ানো—ও-সব জানতেন না তিনি। চট ক'রে মনস্থির ক'রে ফেলতেন, তীরের মতো লাগতেন গিয়ে লক্ষ্যের কেন্দ্রস্থলে—তারপর ভুলে' যেতে এক মুহূর্ত লাগতো না। কাজে-কাজেই সপ্তাহখানেক তিনি প্রচুর আহার করলেন, প্রচুর ঘুমোলেন, আমাকে আর অপর্ণা-দিকে নিয়ে জাদুঘর, চিঁড়িয়াখানা ইত্যাদি ভ্রমণ করলেন, তারপর একদিন আমার জন্য আলপাকার কোট থেকে আরম্ভ ক'রে ব্ল্যাকবর্ড কলম পর্যন্ত বিবিধ ও বিচিত্র উপহার কিনে দিয়ে, মা-র রান্নার অজস্র সুখ্যাতি ক'রে, অপর্ণা-দির কপালের উপর কয়েকবার সশব্দে চুম্বন ক'রে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর আসামে। তাঁকে আর দু'একটা দিন থেকে যাবার জন্য অনেক পিড়াপিড়ি করা হয়েছিলো, কিন্তু তাঁর জোড়হাটের দোকানটা সে-রকম ভালো চলছে না, নতুন ম্যানেজর না-রাখলেই

নয়—এদিকে গৌহাটিতে বসিয়ে এসেছেন সোডা-লেমনেডের কল, তিনি পৌঁছলে তবে সেটা চলবে। সময় নেই, একেবারে সময় নেই, একদিন দেরি করা মানেই সাতদিনের লোকশান।— হ্যাঁ, আসবেন বইকি মাঝে-মাঝে, একটু ফাঁক পেলেই আসবেন— আসতেই হবে, অপর্ণা যখন রইলো।

৩

ব্রজমোহন চ'লে যাবার পর আমাদের বাড়ির শান্ত, রুপালি-ধূসর আবহাওয়া আবার আস্তে-আস্তে নিবিড় হ'য়ে এলো। যেন টলটলে পুকুরে মস্ত একটা ঢিল ছোঁড়া হয়েছিলো, এতক্ষণে আলোড়ন এলো থেমে। তাঁর অন্তর্ধান কোথাও কোনো অভাব রেখে গেলো না—আমাদের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব এমনি আকস্মিক, এমনি অবান্তর। যেন অন্য-কোনো আকাশ থেকে দৈবাৎ ছিটকে পড়েছিলো একটা উপগ্রহ : এখন আবার ঘন-নীল প্রশান্তি।

আর, নীল ফুলের মতো চোখ আর রাত্রির কোনো আশ্চর্য ফুলের মতো শরীর নিয়ে অপর্ণা-দি সেই আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে গেলেন, এক হ'য়ে গেলেন। যেন আমাদের বাড়িরই আত্মা হঠাৎ দৃশ্য রূপ নিয়ে ফুটে উঠলো তাঁর মধ্যে। বাড়িতে-যে একজন লোক বাড়লো, এমন কথাও মনে হ'লো না আমাদের। বরং মনে হ'লো, অপর্ণা-দি চিরকাল ধ'রে এখানেই আছেন, এই বাড়িতে : যেন, তিনি যখন ছিলেন না, তখনও তিনি সম্ভাব্য-রূপে নিহিত ছিলেন এই বাড়িতেই।

শেষ পর্যন্ত স্কুলে দেয়া হ'লো না—বাবারই মত বদলালো। অপর্ণা-দির বয়স তখন ষোলো ধরো-ধরো, অথচ ইশকুলের বিদ্যার যেটুকু তাঁর আয়ত্ত হয়েছিলো, তাতে, হিশেব করলে

দেখা যেতো, ফ্রক-পরা খুকিদের সঙ্গে তাঁকে ভরতি হ'তে হয়। সুতরাং সে-চিন্তা পরিত্যক্ত হ'লো তখনই। ছাড়া স্কুলের খোপ-কাটা পড়াশুনোয় বাবার বেশি আস্থা ছিলো না : ঝুনো পড়ুয়া, তিনি জানতেন যে ঘুরে বেড়াবার খানিকটা ফাঁকা জমি না-পেলে মন শিকড় মেলতে পারে না বিদ্যার মাটিতে। বইয়ের তো অভাব নেই বাড়িতে, তারই মধ্যে অপর্ণাকে ছেড়ে দেয়াই সবচেয়ে ভালো।

আমাদের কাচের বাড়ির মুক্তায়িত আবহ য় বিলীন, নিঃশব্দতায় মগ্ন, অপর্ণা-দি শান্ত শিখার মতো জ্বলতে লাগলেন— মধ্যরাত্রির ম্লান মোমবাতির মতো, কোনো আশ্চর্য-শ্বেত নিশীথ-পুষ্পের মতো, অস্পষ্ট আকাশে নিঃশব্দ কোনো তারার মতো। তাঁকে ঘিরে জড়িয়ে থাকতো স্বপ্নের কুয়াশা, যেন কোনো নামহীন পূজার ধূপের ধোঁয়া। তাঁর মূর্তি সব সময় একটু অস্পষ্ট, একটু সুদূর—যেন ধূপের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখা প্রতিমার মুখ। নিঃশব্দে তিনি চলাফেরা করতেন, সংসারের ছোটোখাটো কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন অকারণে ; পরিচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা মেঝের উপর পা ছড়িয়ে ব'সে শেলাই করতেন, বই পড়তেন ইজি-চেয়ারের বিরাট গহ্বরের মধ্যে ডুবে গিয়ে। প্রাত্যহিক জীবনের অতি সাধারণ এই সব কাজ, কিন্তু তাঁর স্পর্শে রূপান্তরিত। দূর থেকে আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতাম। সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য যেন আমার চোখের সামনে একটু-একটু ক'রে উন্মীলিত হ'তে লাগলো—সেই ছোটো শুভ্র শরীরে, তার ছন্দে

আর ভঙ্গিতে ; সেই নরম, যেন ঘুমে জড়ানো কণ্ঠস্বরের সুরময় অনুরণনে। কেননা আমার কিশোর হৃদয়ের পূজা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে লুটিয়ে পড়েছিলো অপর্ণা-দির পায়ে। আমি তাঁকে ভালোবেসেছিলুম—যে-রকম ভালোবাসতে এক বালকই পারে। আমি তখন ইংরিজি কাব্যসাহিত্যের রক্তিম পক্ক ফলে এলোমেলো কামড় বসাচ্ছি : শেলি আর কীটসের ছেঁড়া-ছেঁড়া, মায়াময় লাইনের সঙ্গে, আমার বালক-কালের উতরোল কল্পনা-রাশির সঙ্গে, বয়ঃসন্ধির রহস্য আর আতঙ্কের সঙ্গে অপর্ণা-দি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। যা-কিছু আমি চাইতুম, যা-কিছু আমি পেতুম না ; যা-কিছু আমার স্বপ্নে আলোড়িত হ'য়ে উঠতো ; যা-কিছু অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য, বিশাল, ভয়ংকর-সুন্দর—অপর্ণা-দি ছিলেন আমার চোখে তার প্রতীক। তাঁকে দেখে-দেখে কখনো তৃপ্তি হ'তো না আমার। তাঁর মুখশ্রী যেন কোনো কবিতা, যার মধ্যে বিস্ময়ের অসীমতার আভাস, কিন্তু যার ভাষা আমি ভালো ক'রে জানি না। আমার সেই বিহ্বল দৃষ্টি তিনিও যে অনুভব না-করতেন তা নয়। মাঝে-মাঝে ধরা প'ড়ে যেতুম। হঠাৎ শেলাই থেকে কি বই থেকে আমার স্তব্ধ বালক-গম্ভীর মুখের উপর তাঁর চোখ পড়তো। উষ্ণ রং লাগতো গালে, ঝলসে যেতো আমার মুখের উপর নীল দৃষ্টির বিদ্যুৎ : লজ্জিত, অভিভূত, আমার গলা থেকে কান অবধি ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠতো। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে ভৎ'সনা ছিলো না ; একটু প্রশ্রয় ছিলো, একটু হয়তো হাসির আভাস। আমার

লজ্জাকে চাপা দেবার জন্য তিনি হয়তো কিছু [illegible]তেন—'কেমন লাগলো?' কি 'বেশ বইটা', কি ঐ রকমই তুচ্ছ কোনো কথা। আর আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করতুম। তেরো বছরের ছেলের মতো দুর্ভাগা জীব কেউ নয়: তার অস্বস্তিকর বয়ঃসন্ধি নিয়ে কোনোখানেই তাকে মানায় না, কারো সঙ্গেই সে মিশতে পারে না; সে নীরব, সে অগঠিত, সে বেখাপ্পা, সে বিশ্রী। আর তেরো বছরের ছেলে আর ষোলো বছরের মেয়ের মধ্যে তো পৃথিবীর সব সমুদ্রের, সমুদ্রের সব জলরাশির ব্যবধান। অপর্ণা-দি যদি আমাকে নিছক উপেক্ষায় ফেলে রাখতেন, সেটা—সেটাই স্বাভাবিক হ'তো, সেটাই আশা করা যেতো। কিন্তু তিনি আমার জন্য নিজেকে নিচু করতেন, আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন যেন মনের দিক দিয়ে আমি তাঁর সমান, আমাকে অংশ দিতেন তাঁর ভাবনার; আমাকে, বলতে গেলে, গ্রহণ করতেন অন্তরঙ্গতার বহিঃসীমায়। আমার মন মূর্ছিত হ'তো আনন্দের নিপীড়নে—অত আশা তো আমি করিনি। আমি যদি একটু তাঁর কাছে বসতে পেতুম, যদি দূর থেকেও তাঁর সৌরভ টেনে নিতে পারতুম নিশ্বাসের সঙ্গে; যদি ছোটোখাটো কাজে লাগতুম তাঁর, দুই চোখ ভ'রে নিতে পারতুম তাঁকে দিয়ে, তাহ'লেই—তাহ'লেই নিজেকে ধন্য মনে করতুম আমি।

বাবার বই পড়ার নেশা আমি পেয়েছিলুম; আর তা নিয়ে যথেচ্ছ অতিচার করবার সুযোগও তিনি দিয়েছিলেন আমাকে। বাড়ির স্তূপীকৃত সাহিত্য-রাশির মধ্যে—বাবার জীবনের একমাত্র

সঞ্চয়—কান-মাথা সুদ্ধু ডুবে থাকবার কোনো বাধা ছিলো না আমার। বাবা বইয়ের জাতিভেদ মানতেন না: সাহিত্যের মধ্যে যা ভালো, তা-ই ছোটো ছেলের অযোগ্য, ইস্কুলমাস্টার কি অশিক্ষিত কলমচির লেখা বিশেষ-এক শ্রেণীর বই-ই ছোটো ছেলেকে পড়তে দেখা যায়, এ-সব কুসংস্কার কখনো স্থান পায়নি তাঁর মনে। সরকারি শিশুপাঠ্য কেতাব আমি বেশি পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না: ছেলেবেলায় সে-সব বই-ই পড়েছিলাম, যা প'ড়ে আরো বেশি আনন্দ পেয়েছি বড়ো হ'য়ে বইয়ের সারির পর দীর্ঘ সারির মধ্যে আমি কোনোরকম বাছ-বিচার না-ক'রে যেমন খুশি ঢুঁ মেরে-মেরে ফিরেছি; অনেক-কিছুই প'ড়ে গেছি না-বুঝে, সুদ্ধু কথাগুলি ভালো লেগেছে ব'লে। রেশ রেখে গেছে মনে, আবছা ছায়া ফেলেছে, হাওয়া দিয়েছে হঠাৎ কোনখান থেকে। এমনি ক'রে তৈরি হ'য়ে উঠছিলো আমার মন। পরে, বয়স যখন বাড়লো, যখন নিজের লেখা লিখে উঠে অন্যের লেখা পড়বার সময়ই প্রায় পাই না, তখন দেখলুম বালক-কালের সেই অনেক অসম্পূর্ণ-ক'রে-বোঝা ইঙ্গিত, অনেক প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য ফিরে আসছে পরিপূর্ণ প্রকাশের মহিমা নিয়ে।

এক সকালবেলায় আমি যখন স্নানের বৈধ সময় লঙ্ঘন ক'রেও বই পড়ছি, অপর্ণা-দি ঘরে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই বইয়ের পাতায় চোখ নামালুম: সেই মুহূর্তে গল্পের রসে আমি এমনিই ডুবে

গিয়েছিলুম যে অপর্ণা-দির সান্নিধ্যও আমার মনকে বিভ্রান্ত করতে পারলো না।

অপর্ণা-দি জিগেস করলেন, 'কী পড়ছো?'

বললুম, ' "চোখের বালি।" '

' "চোখের বালি?" ' কৌতূহলে অপর্ণা-দির ভুরু একটু উত্থিত হ'লো।

নিজের বিদ্যের ঝুড়ির ঢাকনাটা অপর্ণা-দির সামনে একটু খুলে দেখাবার লোভ সামলাতে পারলুম না। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জানো না? খুব ভালো গান লেখেন।'

'ও, হ্যাঁ', অপর্ণা-দি তৎক্ষণাৎ বললেন, ' "বঁধু, তোমায় করবো রাজা তরুতলে"—'

'জানো?' আমি লাফিয়ে উঠলেম, 'জানো ওটা? গাইতে পারো?'

'আমি তো গাইতে পারি না। গৌহাটিতে আমাদের পাশের বাড়ির একটি মেয়ের মুখে শুনেছি।'

আমার নিরাশা গোপন করবার চেষ্টা ক'রে বললুম, 'খুব ভালো গান লেখেন রবীন্দ্রবাবু। "বাল্মীকি-প্রতিভা" পড়েছো?'

না, অপর্ণা-দি সেটা পড়েননি, বলতে গেলে কিছুই পড়েননি। সত্যি বলতে, তাঁর শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ছিলো রীতিমতো শোচনীয়। গৌহাটিতে সে-সময়ে মেয়েদের কোনো স্কুল ছিলো না, গির্জের সংলগ্ন ছোটো মিশনারি স্কুলে ফ্রক পরা অবস্থায়

তিনি দু' এক বছর লজঞ্চুষ আর রঙিন ছবি উপহার পেয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন চলেনি। কাকিমা খৃস্টানদের পছন্দ করলেন না। তা ছাড়া, মেয়েদের সাংসারিক কলাকৌশলে নিপুণ হ'লেই চলে। আর মেয়ের বিয়েতে যা খরচ হবে, তার উপর যদি আবার ইশকুলেও টাকা ঢালতে হয়, তাহ'লে—ইত্যাদি। বাড়িতে রামায়ণ আর মহাভারত ছিলো, তা তিনি পড়েছেন। গৌহাটিতে কোনো বই পাওয়া যায় না—তবে, তবে, হ্যাঁ, তাঁদের বাড়িতে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' আসতো বটে।

অপর্ণা-দি জিগেস করলেন, ' "চোখের বালি" কেমন বই ? '

'ওঃ, চমৎকার।' সমালোচনার প্যাঁচওলা পরিভাষা তখনও আয়ত্ত করিনি; ভালোকে নিতান্তই ভালো আর মন্দকে নিছক মন্দ বলা ছাড়া উপায় ছিলো না।

বইখানা আমার হাত থেকে নিয়ে অপর্ণা-দি একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। বললুম, 'পড়বে তুমি ?'

'তোমার হোক।'

'আমি তিন বার পড়েছি।'

অপর্ণা-দি আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি তো খালি পড়োই।'

ঈষৎ লজ্জিত, ঈষৎ গর্বিত, আমি চুপ ক'রে রইলুম। কোনো-একটা ক্ষেত্রে অপর্ণা-দি আমাকে এতটুকু স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, এ-কথা ভেবে আমার বুকের ভিতরটা আনন্দে জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

সেই বইয়ের জগৎ হ'লো আমাদের মিলনস্থল—আমার, আর অপর্ণা-দির। জীবনের ক্ষেত্রে আমি তাঁর তুলনায় যতই ছোটো হই, সেখানে আমি তাঁর অগ্রজ। আমি সেখানে নির্দেশকর্তা, তিনি অনুগামী। আমি ওল্ড কিউরিঅসিটি শপ পড়েছি আর হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম, মিল্টন আর শেক্সপিঅর থেকে আমি আবৃত্তি করতে পারি, ইতিমধ্যেই শেলির দু-একটা কবিতা তর্জমা ক'রে ফেলেছি। বঙ্কিমের কোন-কোন চরিত্র ঠিক কী-অবস্থায় ম'রে গিয়ে ফের বেঁচে উঠেছিলো তা আমি বলতে পারি এক নিশ্বাসে, রবীন্দ্রবাবুর কোনো-কোনো গীতিকাব্য আমার আগাগোড়া মুখস্থ। বাংলা মাস শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে 'প্রবাসী'র আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আমার যেন জ্বর আসে। আর অপর্ণা-দি—তাঁকে যতই ভালোবাসি, তাঁর অজ্ঞতায় দুঃখবোধ না-ক'রে উপায় কী আমার।

যুগল-মলাটে আবদ্ধ কথার সেই অরণ্যে আমি অপর্ণা-দিকে নিয়ে চললুম পথ দেখিয়ে। সেই ভূমিকায় নিজেকে আমি খুব উপভোগ করলুম, আমার আত্মসম্মান হঠাৎ অনেকখানি বেড়ে গেলো। সেইখানে, কথার সেই জগতে, আমি অপর্ণা-দির সঙ্গে সমান হ'য়ে, সমতলভূমিতে এসে দাঁড়ালুম: অনুভূতির ঐক্যের অদৃশ্য যোগাযোগ পরস্পরের মধ্যে আন্তর্গতিশীল বিদ্যুৎ-স্রোতের মতো। সেইখানে, ভাবের উত্তপ্ত বাষ্পপুঞ্জে আমরা পরস্পরের মধ্যে সংবেদিত, একীভূত হ'য়ে গেলুম।

দীর্ঘ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আমরা গল্প করতুম—কথা, সত্য-

নিঃশেষিত, বহুবার-পঠিত, দুই মনের সংযোজনায় নতুন ক'রে আবিষ্কৃত কোনো বই নিয়ে, বই থেকে : প্রসঙ্গক্রমে, বয়ঃসন্ধির গোপন স্বপ্নের পক্ষবিস্তার : কবিতা আওড়ানো, কথা নিয়ে খেলা। অপর্ণা-দির কাছে শুনতুম পুরাণের গল্প : আমি যত ভালো ক'রে বৌঠাকুরাণীর হাট আর রাজসিংহ আর মায়ার খেলা জানতুম, তত ভালো ক'রে তিনি জানতেন স্যমন্তক মুনির উপাখ্যান আর অর্জুনের বিভিন্ন প্রণয়-কাহিনী আর শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ, জটিল জীবন-চরিত আর নষ্টচন্দ্রের তাৎপর্য আর শিখণ্ডীর প্রকৃত রহস্য আর—ওঃ, সে অনেক, সে অনেক। শুনতে-শুনতেই মাথা গুলিয়ে যেতো আমার। পুরাণে আমার শিক্ষা লজ্জাকর-রকম অসম্পূর্ণ ছিলো : তখন পর্যন্ত উপেন্দ্রকিশোর আর কুলদারঞ্জনের আবির্ভাব হয়নি, আর কাশীরাম দাসের নড়বড়ে পয়ারে আমি কখনোই এগোতে পারিনি বেশিদূর। আমার শিক্ষায় এই একটা মস্ত ফাঁক ছিলো : অপর্ণা-দি সেটা পূরণ করলেন। মানুষের সেই সমুদ্রের মধ্যে কে কার গতজন্মের মামা আর কে কার এ-জন্মের খুড়ো : কোন্ মুনি ঠিক কী-রকম ঘটনাচক্রে কাকে কী-শাপ দেন আর তার প্রতিক্রিয়া কী-ভাবে কতদূর পর্যন্ত গড়ালো : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়কদের বীরত্বে ঠিক কে কার পরে : যুদ্ধের অষ্টম দিনে ক' অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হয়, এই সব বৃত্তান্ত তিনি অনায়াসে, নির্ভুলভাবে, মুহূর্তকাল চিন্তা না-ক'রে বলতে পারতেন। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে যেতুম : মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত হ'য়ে শুনতুম। গল্পের টানে চ'লে আসতো

গল্প, একটা বোঝাবার জন্য আর-একটা, সেটার সূত্র ধ'রে আবার অন্য-কোনো কাহিনী—আমার মতো অজ্ঞের কাছে সম্পূর্ণ বোধ্য করবার জন্য এত ঘন-ঘন প্রসঙ্গের বদল হ'তো যে হঠাৎ এক সময় দেখা যেতো, আমাদের দু'জনেরই অজান্তে মূল গল্প কোথায় গেছে হারিয়ে, এসে পড়েছে একেবারে অন্য কথা—সে-সব কাহিনীর কখনো যেন শেষ হবে না, ক্লান্তি আসবে না সারাদিন ভ'রে শুনলেও। অপর্ণা-দির মুখে সে-সব কথা শুনতে-শুনতে আমি তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত, নতুন এক জগতে প্রবেশ লাভ করলুম: গীতিকাব্যের ইন্দ্রজাল নয়, এপিকের বিশালতা—যে-জগৎ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানুষ যেখানে নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, বলশালী: যেখানে প্রেম, প্রতিহিংসা, তপস্যা, নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা সব বীর্যময়, মহান: হত্যা যেখানে ঘৃণাহীন, মৃত্যু যেখানে শোকমুক্ত। রোমান্সের রঙে আর লিরিকের লীলায় আত্মহারা আমি, এই নির্মম, লবণাক্ত সমুদ্রে স্নান করবার আমার প্রয়োজন ছিলো। পারস্পরিক ভাব-প্রবাহে আমরা দু' জনেই পূর্ণতর হ'য়ে উঠলুম, দু' জনে গৃহীত হলুম দু' জনের মধ্যে, শিখা থেকে জ্ব'লে উঠলো শিখা।

৪

অপর্ণা-দির খুব শিগগির বিয়ে দেন, এমন ইচ্ছা বাবার ছিলো না। আর এ-ক্ষেত্রে, বাবার ইচ্ছার সঙ্গে বিধাতার অভিপ্রায়ের আশ্চর্য মিল দেখা গেলো, যতবারই কোনো পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়—কথাবার্তা বেশি দূর এগোবার আগেই কী ক'রে যেন ফশকে যায় নিজে থেকেই। অবশ্য খুব-যে একটা প্রবল চেষ্টা চলছিলো তাও নয়। প্রথমটায় মা টাটকা-পাশ-করা কোনো-না-কোনো যুবকের খোঁজ এনে দিতেন বাবাকে: তাঁকে মৃদু একটু তাড়া দিতেন কয়েকবার: দু'একখানা চিঠিপত্র কি একটু আলাপ হয়তো চলতো—ব্যস। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই। আর তার ফলে যে আমাদের বাড়িতে কারো কখনো হৃৎভঙ্গ হয়েছে এমন লক্ষণ তো দেখিনি। তবু, অনেকদিন পর্যন্ত, যেন নেহাৎই কর্তব্যবোধের তাড়নায় মা মাঝে-মাঝে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতেন: বাবা হুঁ-হাঁর বেশি জবাব দিতেন না, মা যেন আশাও করতেন না তার বেশি। এমনও সন্দেহ করি যে বাবা আদর্শ গুরুজনোচিত উৎসাহ প্রকাশ ক'রে ফেললে মা মনে-মনে খুব খুশি হতেন না—নিজের তো একটা মেয়ে হ'লো না, এ-মেয়েটা যদ্দিন কাছে থাকে—মা-র মনের ভাবখানা এইরকম। বিবেককে একটু পিঠ চাপড়ে ঠাণ্ডা করা—এর বেশি ও-সব কথার আর-কোনো উদ্দেশ্য কি ছিলো? জানি না।

কিন্তু এটা লক্ষ্য করলুম যে আরো কিছুদিন পরে মা, তাঁর বিবেককে শান্ত করতেও ভুলে' গেলেন: অপর্ণা-দির বিয়ের প্রসঙ্গটা অল্পে-অল্পে কেমন জুড়িয়ে গেলো, মুছে গেলো সকলের মন থেকে। মেয়ের যে কখনো বিয়ে দিতে হবে, বিয়ের জন্যই যে তাকে আনা হয়েছে এখানে, এই অত্যন্ত জরুরি কথাটা এমন চাপা পড়লো যে চাপা পড়াটাও লক্ষ্য করলো না কেউ। আর কাকাবাবু? তাঁর নিজের অস্তিত্বটাই ভালো ক'রে স্মরণ করবার সময় হয় না তা মেয়ে তো মেয়ে।

মা মাঝে-মাঝে বলতেন, 'অপর্ণা, তোর বিয়ে হ'য়ে গেলে কী ক'রে টিঁকবো বল তো?'

অপর্ণা-দি তাঁর শান্ত নীল চোখ মা-র দিকে তুললেন।— 'আমি আসবার আগেও তো ছিলে।'

'শোনো কথা!' মা হাসলেন একটু, 'ওরে বোকা মেয়ে, সেইজন্যই তো! তুই আসবার আগে তো বেশ ভালোই ছিলুম।'

'আমি চ'লে গেলে খুব কি তোমার কষ্ট হবে, জ্যাঠাইমা?'

'চ'লে আবার যাবি কোথায়? অলক্ষুনে কথা বলতে বাপু একটু যদি আটকায় তোদের মুখে।'

মা স্বভাবত দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন না: কিন্তু অপর্ণা-দি সম্বন্ধে তাঁর মনে কেমন একটা কুসংস্কার ছিলো। যেন সব সময় চাপা একটা ভয়—নামহীন, নিরবয়ব একটা আতঙ্ক, যা তাঁর

বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠতো তুচ্ছ কোনো কথায়, হালকা কোনো ঠাট্টায়। আগে থেকেই কোনো ছায়া কি পড়েছিলো তাঁর মনে? তিনি কি জানতে পেরেছিলেন আগেই? ভেবে অবাক লাগে।

তিন বছর কাটলো। ইশকুলের বেড়া ডিঙিয়ে আমি ভরতি হলুম কলেজে। অলক্ষিতে অপর্ণা-দির আর আমার মধ্যে ব্যবধান দূর হ'য়ে গেলো। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমি তাঁর সমবয়সী। বইয়ের বাইরে যে-পরিমিত, পুরোনো জগৎ, তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে মতামত বিনিময় করলে এখন আর বেমানান হয় না। আমি তাঁর হাসিতে যোগ দিতে পারি; তাঁকে হাসাতে পারি। তাঁর মনের গোপনতার অংশ নিতে পারি। আর তাঁকে বলতেও পারি আমার মনের ভাবনা: নবযৌবনের কল্পনা আর বেদনার রাশি। আমার চাল-চলন, আমার কথাবার্তা অনেক স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ হ'য়ে গেলো; আমি লাল হ'য়ে না-উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারি, তাঁর পাশে একটু বসলেই বোকার মতো ঘেমে উঠি না। বালকের তরল অবিরল পূজা স্ফটিক-কঠিন হ'য়ে উঠলো যৌবনোন্মেষের বন্ধুতায়। আরক্ত গোলাপের মতো অপর্ণা-দি পল্লবে-পল্লবে জ্ব'লে উঠলেন আমার চোখে; আর সেই উত্তাপে আর দীপ্তিতে আমি ফুটে উঠলাম, রূপান্তরিত হলাম। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুতার মধুর উষ্ণতায় সমস্ত আকাশ ভ'রে ফুল ফুটলো।

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।

হঠাৎ এ-দুটো লাইন মনে প'ড়ে গেলো। এ-দুটি লাইন দশ হাজার বার আবৃত্তি ক'রেও যেন আমার তৃপ্তি হ'তো না— সে-সময়ে। আ, সত্যি, সত্যি কথা। আমি যেন অনুভব করতাম, আকাশ ভেঙে-ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে আমার গায়ে পাপড়ির পর নরম পাপড়িতে। সেই অনুভূতির মতো আর-কিছু নয়। জীবন ভ'রে অনেক দেখেছি আমি, অনেক করেছি, মুঠি-মুঠি গোলাপ দিয়েছি ছিটিয়ে—আর প্রতিবার নতুন ক'রে জেনেছি এই কথা যে যৌবনের প্রথম প্রেরণায় আকাশ যখন ফুলে-ফুলে ছেয়ে যায়, তার মতো আর কিছু নয়, আর-কিছুই নয়।

একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। গলির উল্টো দিকের বাড়িতে একটা রেকর্ড বাজছিলো—বিলেতি বেহালার বাজনা, রাস্তার দিকের সরু বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি আর অপর্ণা-দি শুনছিলাম। অদ্ভুত বাজনা; সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে আমরা চেষ্টা করছিলুম সমস্ত শ্রবণশক্তিকে নিয়োগ করতে। অদ্ভুত গ্রীষ্ম-সন্ধ্যা, মাঝে-মাঝে একটু হাওয়ার নিশ্বাসে টোল-খাওয়া, অদ্ভুত বেগনি রঙের আকাশ। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ, প্রায় নিজেরই অজান্তে আমি ব'লে উঠলাম:

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।

আমার মুখের কথা ভালো ক'রে শেষ হ'তে-না-হ'তে অপর্ণা-দি আমার হাতের উপর আস্তে হাত রেখে বললেন, 'আঃ, চুপ করো।' মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো তীব্র চকিত বিদ্যুতে ; আর সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলুম, ও-দুটি লাইনের মানে কী।

৫

এই গল্পের মুখ্য পাত্রের অবতারণা করব সময় হ'লো। নাম তাঁর কল্যাণকুমার। বাবার প্রিয় ছাত্র প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গে ক্লাশের সাধারণ সরকারি যোগাযোগেই তৃপ্তি হ'তো না বাবার, তিনি তাদের ডেকে আনতেন বাড়িতে; দান্তের কোনো-একটা শ্লোকের রূপকের ব্যাখ্যা নিয়ে, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কোনো ক্রুবাদুর কবিকে নিয়ে, ইংরিজি ব্যালাডের ক্রম-বিবর্তন নিয়ে আলাপ করতেন; ধার দিতেন বই, অনেক ক্ষেত্রেই ফিরে পেতেননা। মনে করতেন আর দেবেন না, তবু সময় হ'লে আবার নিজে থেকে, গায়ে প'ড়েই দিতেন—'এ-বইটা তোমাকে পড়তেই হবে নিয়ে যাও।' মা-র উপর বরাদ্দ ছিলো ছেলেরা কেউ এলেই প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থার। বাবা যা শোনাতেন আর মা যা বানাতেন, দুটোই যে অত্যন্ত সারবান, সে-বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে কখনো মতভেদ ঘটেনি।

অনেক বিদ্যার্থীকেই দেখেছি যেতে-আসতে—একদল চ'লে গেলে আর-এক দল এসেছে—এর মধ্যে হঠাৎ একজন আটকে গেলেন আমাদের বাড়িতে, প্রিয় ছাত্র থেকে প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলেন বাবার। তার অবশ্য কারণও ছিলো; আকারে প্রকারে স্বভাবে পারিপার্শ্বিকে এই যুবকটি ছিলেন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। মা-বাবা উভয়েই মৃত; আত্মীয়-স্বজনের বালাই নেই। বিত্তশালী;

পূর্ববঙ্গের ছোটোখাটো জমিদার গোছের। থাকতেন হস্টেলে, তখনকার দিনে মাসে দেড়-শো থেকে ছু'শো টাকা খরচ করতেন—কী ক'রে অত খরচ হ'তো তিনি জানেন না। সে-যুগের সীরিঅস ধরনের ছাত্র (সেই একটা টাইপ, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লোপ পেয়েছে দেশ থেকে) ;—তাঁদের একজন, যাঁরা উচ্চশিক্ষায়, মহৎ জীবনে (কথাগুলি কি আজকালকার দিনে একটু হাস্যকর শোনায়?) বিশ্বাস রেখেছিলেন ডারুইনের মন্ত্রণায় যাঁরা মন্ত্র নিয়েছিলেন প্রোগ্রেস কিনা অগ্রগামিতার—আলোক-বিতরণ, স্বাস্থ্যবিকীরণ, সুখ-স্ফীতি, মানবজাতির কল্যাণ-সাধনা, এই সব আর এই সব। সীরিঅস, ভয়ংকররকম সীরিঅস, এই কল্যাণকুমার। কলেজের পড়া নিয়ে ভীষণ পরিশ্রম করতেন তিনি (পরে আমি ভেবে অবাক হয়েছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য একটা পরীক্ষা পাশ করবার জন্য তিনি অত বেশি খাটতেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও মনে হয়েছে যে সেটা শুধু পরীক্ষা পাশের উদ্দেশ্যে তো নয়—ও-রকম না-ক'রে তাঁর উপায় কী : অমন প্রচুর প্রাণশক্তির যে-কোনো একটা ব্যবহার তো চাই!)—নিয়ম রাখতেন না স্নানাহারের ; ভুলে যেতেন একই জামা ক'দিন ধ'রে গায়ে রাখলে ভব্যতার সীমা পেরিয়ে যায় ; হঠাৎ খিদের তাড়নায় সবচেয়ে কাছের দোকানে ঢুকে প'ড়ে যে-কোনো খাদ্য বা অখাদ্য খেয়ে অসুখে ভুগতেন ছুদিন ; কলেজের ডিবেটিং সোসাইটিতে পৌত্তলিকতা কি স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে (হায়রে সে-যুগের সমস্যা! হায়রে গেলো বছরের তুষার!) বক্তৃতা করতে-করতে অশোভন-

রকম উত্তেজিত হ'য়ে পড়তেন, প্রতিপক্ষের কোনো ব্যঙ্গে, তাঁর মতে মূঢ়তায়, সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সংবৃতি হারিয়ে ঝড়ের মতো মেজাজে ছুটে চ'লে যেতেন বাইরে ; বাড়ি ফিরে লিখতে বসতেন তখনকার দিনের লম্বা-লম্বা শব্দওলা ওজনদার ইংরেজিতে দৈনিকপত্রের জন্য সুতীব্র প্রবন্ধ। সে-সব প্রবন্ধ আদৃত হ'তো তখনকার পাঠক-সমাজে। তবে, সবাই বলতো, লেখাগুলি একটু এলোমেলো, একটু বেসামাল। সেটা বিস্ময়ের নয়, কেননা, তিনি মানুষটাই ছিলেন এলোমেলো স্বভাবের। তিনি অজস্র কথা বলতেন, ভুলে' যেতেন, ঠিক আগের মুহূর্তে কী বলছিলেন, অন্য পক্ষ শুনছে কিনা, ক্লান্ত হচ্ছে কিনা, কিছু বলতে চাচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করবার তাঁর সময় হ'তো না। কাউকে কোনো কথা দিয়ে তিনি মনে রাখতে পারতেন না, কোনো জায়গায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'তে পারতেন না ; যদি কোনো কাজ তাঁকে করতেই হ'তো, অসম্ভব তাড়াহুড়ো ক'রে, ব্যস্ততার দস্তুরমতো একটা টর্ন্যাডো তুলে দিয়ে তবে তা করতেন। সব সময় তিনি ছটফট করছেন, টগবগ করছেন, দু' মিনিট শান্ত হ'য়ে এক জায়গায় বসতে পারছেন না—যেন এক্ষুনি, এ ক্ষু নি একটা-কিছু ক'রে না-ফেললে কোথায় কী-একটা মস্ত সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। এমন মানুষের ব্যবহারে মাঝে-মাঝে বিশৃঙ্খলা ঘটবেই : কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে (আর কী সহজেই তিনি উত্তেজিত হতেন!) তিনি এমন আবেগভরে নিতম্বদেশ কণ্ডূয়ন করতেন যে

নিরপেক্ষ দর্শকের চোখে তা একটু দৃষ্টিকটুই ঠেকতো। মাত্রাজ্ঞানের, কখনো বা কাণ্ডজ্ঞানের আশ্চর্য অভাব দিয়ে বিধাতা তাঁকে তৈরি করেছিলেন—যখন যে-কথা তাঁর মুখে আসতো সেটা বলতেই হবে, যখন যেদিকে মন ছুটলো সেটা না-করলেই নয়। বন্য ঘোড়ার মতো অশান্ত তিনি, ঝোড়ো স্বভাব নিয়ে আমাদের ভিতর দিয়ে ছুটে গেলেন—নিয়ে এলেন তাঁর গতির আবেগের টানে ধ্বংস আর মৃত্যু।

প্রথম যেদিন কল্যাণকুমার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, কথা ব'লে-ব'লে বেচারা বাবাকে আধ-মরা ক'রে দিয়েছিলেন—এত কথা বলেছিলেন যে পর-পর তিন পেয়ালা চা অস্পৃষ্ট অবস্থায় ঠাণ্ডা হয়েছিলো। পাশের ঘর থেকে আমরা তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বরের দেয়াল-প্রতিহত গম্ভীর ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলুম, কথাগুলি ঠেলে বেরোচ্ছে একটার পর একটা, নিশ্বাস নেবার সময় নেই। ব'সে থেকে-থেকে নীল হ'য়ে গিয়েছিলেন বাবা, তবু চমৎকৃতও হয়েছিলেন, ছাত্রটিকে ব'লে দিয়েছিলেন আবার আসতে। বলবার প্রয়োজন অবশ্য ছিলো না। কল্যাণকুমার হয়তো তাঁর জীবনে আমার বাবার মতো এমন ধৈর্যশালী শ্রোতা পাননি। তিনি আবার এলেন, আবার। তারপর একদিন সোজা কলেজ থেকে এসে উপস্থিত হলেন: তাঁর একটা প্রবন্ধের জন্য স্কটল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস-ঘটিত কী-একটা ইতিবৃত্ত দরকার। প্রথম জেমস পরে হবে, আগে জলযোগ হোক। অন্যমনস্কভাবে কথা বলতে-বলতে, মাঝে-মাঝে বাঁ হাত দিয়ে কোলের উপর

শায়িত একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে কল্যাণকুমার ঠিক তেরোখানা লুচি খেলেন, আর আনুষঙ্গিক তরকারি আর মিষ্টি। এবার চমৎকৃত হলেন মা। হস্টেলের ভাত খেয়ে কি মানুষের প্রাণ বাঁচে!

দেখতে-না-দেখতে কল্যাণকুমার অন্তঃপুরের বেড়া ডিঙিয়ে এলেন—আমাদের বাড়ির যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো সময়ে তাঁর অবাধ গতিবিধি; কোনো নিষেধ, কোনো নিয়ম তাঁর জন্য নয়—তিনি উথলে উঠছেন, উপচে পড়ছেন। জেনে-শুনে যে নিজের অধিকার লঙ্ঘন করতেন তা নয়; কোনটা যে তাঁর বৈধ অধিকার নয় সে-বিষয়েই সচেতন নন তিনি: যে-অন্তরঙ্গতায় পৌঁছতে কোনো সাধারণ লোকের এক বছর লাগতো, দু' দিনের মধ্যেই তিনি অনায়াসে চ'লে এলেন সেখানে, কোথাও এতটুকু বাধলো না। আমি দেখেছি, কোনো কাজ চিন্তাহীন স্বাচ্ছন্দ্যে করতে পারলেই কেমন সুন্দর মানিয়ে যায়; ইতস্তত করলেই, এদিক-ওদিক ভাবতে গেলেই বিপদের উপর বিপদ জড়ো হ'তে থাকে। আমাদের গৃহে কল্যাণকুমারের এই প্রবেশে কোনো চেষ্টা ছিলো না: তিনি শুধু উচ্ছ্বসিত একটা ঢেউয়ের মতো এসে ভেঙে পড়লেন—এবং থেকে গেলেন। ভদ্র প্রথার সব অনুশাসন কোথায় গেলো ভেসে। তাঁর কাছে সে-সবের অস্তিত্বই নেই; তিনি সেগুলিকে অতিক্রম পর্যন্ত করলেন না, নিছক অস্বীকার করলেন। আর দেখতে-দেখতে, আমাদের মনেরও সব বেড়া ভেঙে গেলো, নিজেদেরই অলক্ষিতে।

কখন যে কল্যাণকুমার ঠিক আমাদেরই বাড়ির একজন হ'য়ে উঠলেন, তা বুঝতেই পারলুম না আমরা। কিছুদিনের মধ্যেই যখন দেখা গেলো, তিনি মা-র কাছে গিয়ে বলছেন, 'দিদি, একদিন ইলিশ মাছের কাঁটা আর কুমড়ো দিয়ে চচ্চড়ি রাঁধবে?' আর মা হেসে বলছেন, 'আহা—কী-এক অপূর্ব জিনিশই খেতে চাইলেন!' তখন ব্যাপারটা কারো কাছেই এতটুকু অস্বাভাবিক ঠেকলো না। মা-কে তিনি নিজেরই অন্তরের কোনো আকস্মিক প্রেরণায় দিদি ডাকতে আরম্ভ করেন; আর মা তাতে খুশিই হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। মা-র একটু স্নেহ পড়েছিলো এই উদ্দাম, বিশৃঙ্খল যুবকের উপর—সে উদ্দাম এবং বিশৃঙ্খল ব'লেই। কেননা আমি এটা দেখেছি যে যে-মানুষ নিজের যত্ন নিজে নিতে পারে, মেয়েরা তাকে ভালোবাসে না। যে এলোমেলো, যে অগোছালো যাকে নিয়ে অনেক জ্বালা, মেয়েরা মুখে তার সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করে, কিন্তু মন দেয় তাকেই। যে-মানুষ ঠিক ঘড়ি ধ'রে স্নানাহার করে, সব সময় হাতের কাছে জামা-কাপড় খুঁজে পায়, মেয়েরা তাকে ভুলে' থাকে অনায়াসেই। আমাকে বিধাতা স্ত্রীজাতির ভালোবাসার বিশেষরকম অযোগ্য ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন: শিশুকাল থেকে আমি অত্যন্ত শান্ত, নেহাৎই ভালো, চিরকাল আমি নেহাৎই ভালোমানুষ। মেয়েদের মাঝে-মাঝে আঘাত দিয়ে মনে করিয়ে দিতে হয় যে আমি আছি, তা না-হ'লে মনে রাখতে পারে না তারা। সে-ক্ষমতা ছিলো না আমার। ছেলেবেলা থেকেই আমার কুনো স্বভাব: কখনো কাউকে ঘাঁটাতে

যাইনি, আর শুধু এ-ই চেয়েছি; আমাকে যেন কেউ ঘাঁটাতে না আসে। শিশুকালে নাওয়া-খাওয়া, সাজ-পোশাক কি এটা-ওটা নিয়ে আমি কখনো কোনো উপদ্রব করিনি : কোনো অন্যায় করিনি; সব সময় আদর্শ বালকের সবগুলি নিয়ম মেনে চলেছি। বাবা কি মা একবার যা ব'লে দিতেন, তার অন্যথা আমি ম'রে গেলেও করতে পারতুম না। এমন ছেলে হয় না, সবাই বলতো। মা হাসতেন। সত্যি, ছেলে এ-রকম হ'লে তাকে মানুষ করা আর মুশকিল কী। নিজেদের এক-একটি দস্যুরূপী অপত্যকে স্মরণ ক'রে মা-র সখীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। কিন্তু মা-র মনের কথা তাঁরা জানতেন না। আমিও জানি না। মা নিজেও জানতেন কিনা সন্দেহ। আমি শুধু এটুকু জানি যে আমার জন্য মা-র কোনো ভাবনা ছিলো না। ভাবনা মানে দুর্ভাবনা। আমি জন্মেছিলাম নিঃসঙ্গতার অভিশাপ নিয়ে, আমি বিচ্ছিন্ন ছিলাম মা-র জগৎ থেকে, স্নেহে সেবায় বিজড়িত তাঁর পরিমণ্ডল থেকে। ও-সবে প্রয়োজন ছিলো না আমার : নিজের ভার নিজেই আমি বহন করতে পারতুম, আমি সম্পূর্ণ ছিলুম নিজেরই মধ্যে।

কিন্তু এই উদ্‌ভ্রান্ত উতরোল কল্যাণকুমার—তাঁর কথা আলাদা। প্রকাণ্ড তাঁর প্রয়োজন, প্রচণ্ড তাঁর দাবি। তিনি কোথায় থাকেন, কী খান, রাত্তিরে কেমন ক'রে ঘুমোন, কিছুরই ঠিক নেই, কিছুই তাঁর নিজের মনে থাকে না, সব সময় তিনি অন্য-কোনো কথা ভাবছেন। তাই তাঁর জন্যই সব ভাবনা,

তাঁর হ'য়ে আর-একজনের সব মনে ক'রে না-রাখলে কি চলে? তাঁর কাণ্ডজ্ঞান নেই, অনেক সময় তিনি অত্যাচার করেন, অতি সামান্য কথায় হঠাৎ চ'টে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, এমনকি—এ-ও মাঝে-মাঝে হয়েছে—চোখের জল ফেলেন; তাঁকে সামলানো সোজা নয়, তাঁকে নিয়ে অনেক যন্ত্রণা—কিন্তু সেইজন্যই তো তাঁর উপস্থিতি অমন জাজ্বল্যমান। উপায় আছে তাঁকে ভুলে' থাকার? স্বভাবতই, আমার মা-র মন পড়েছিলো এই অসংযত, বিস্রস্ত যুবকের উপর; মা একটা-কিছু করবার পেলেন তাঁর মধ্যে। তিনি কী-কী খেতে ভালোবাসেন, মা অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে তাঁর বাক্যরাশি থেকে খুঁটে-খুঁটে সে-তথ্য উদ্ধার করেছিলেন; তাঁর জামা-কাপড়ের শুভ্রতা মা-র একটা সাধনা। আর কল্যাণকুমারও তাঁর দিদির অত্যন্ত অনুগত, অনুরক্ত হ'য়ে পড়লেন—বাল্যকালে মাতৃহীন, আত্ম-দানে, প্রাণ-পালনে উৎসুক স্ত্রী-জাতির সঙ্গে এ-ই বোধহয় তাঁর প্রথম সংস্পর্শ। আর তাঁর জীবনের এতদিনের সেই অভাব তিনি যেন পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণরও বেশি ক'রে মিটিয়ে নিতে লাগলেন মা-কে দিয়ে; তাঁকে তিনি উদ্ব্যস্ত, অস্থির ক'রে তুলতে লাগলেন আবদারে, অত্যাচারে, অকারণ প্রবল কলহে, শিশুর মতো অভিমানে, স্নেহ-লোভের উত্তপ্ত তীব্রতায়।

এতদিন কল্যাণকুমারের যদি বা নিজের জন্য দায়িত্ববোধের একটু ছিটেফোঁটা ছিলো, এইবার আমার মার আশীর্বাদে তা-ও বিসর্জন দিয়ে তিনি নির্জলারকম উৎকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠলেন।

নামত তিনি তখনও হস্টেলেই থাকেন, যদিও, যেটুকু সময় তার বাইরে—গোলদিঘিতে, চায়ের দোকানে, সভা-সমিতি, লাইব্রেরি, কলেজ ইত্যাদিতে না কাটে, তা বলতে গেলে কাটে আমাদের বাড়িতেই। সমস্ত বাড়ি ভ'রে তিনি যেন ছড়িয়ে আছেন—এখানে তাঁর ময়লা জামা-কাপড়ের স্তূপ ধোবার প্রতীক্ষা করছে; ওখানে কোনো বিরল সচেতনতার মুহূর্তে চুল আঁচড়াতে গিয়ে তিনি চিরুনিখানাকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে রেখে গেছেন; ঐ টেবিলে ব'সে তিনি একটা বই থেকে নোট নিচ্ছিলেন—হঠাৎ কী মনে পড়লো, বই খাতা উপুড় ক'রে রেখে বেরিয়ে গেলেন —কখন ফিরবেন কে জানে—পেনসিলটা গড়িয়ে মেঝেয় প'ড়ে ভেঙে গেছে; সকালবেলায় বাথরুমে যে-বইখানা ফেলে এসেছিলেন তা চৌবাচ্চায় প'ড়ে গিয়ে এক কাণ্ড। সমস্ত বাড়ি ভ'রে তিনি, কল্যাণকুমার। তাঁর সব অপকৃতির পরিপূরণে আমাদের প্রতিটি ঈশ্বরের দিনের অনেকটা ব্যয়িত হ'তো। দিনে দশ বার তাঁর চশমা হারাচ্ছে, আর চশমার খাপ হারাচ্ছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রুমাল। আর প্রতিবার একটা ছোটখাটো তোলপাড় উঠছে বাড়িতে। আমাদের বাড়ি, আমাদের সময়, আমাদের মন—সমস্তটা ভ'রে তিনি ছড়িয়ে পড়লেন দেখতে-দেখতে।

সেই সময়কার তাঁকে আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি—আমাদের ভিতরের দিকের বারান্দায় (আমাদের পারিবারিক পাটি-বিছোনো ড্রয়িংরুম) বন্য পশুর মতো পাইচারি

করতে-করতে উচ্চৈঃস্বরে পড়ছেন চাইল্ড হ্যারল্ড। মুগ্ধ, বিস্মিত, ভীত, আমি স্তব্ধ হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতুম—পুরো ছ' ফুট লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া মূর্তি, গায়ের রং পীত-স্পৃষ্ট শুভ্র, মাথা-ভরা ঝাঁকড়া চুল আবৃত্তির বেগে থেকে-থেকে দুলে উঠছে, পাইচারি করতে-করতে বিশেষ-একটা জায়গায় স'রে আসতেই বিকেলের পড়ন্ত আলোর একটা রেখা ঝলসে উঠছে চোখের চশমায়। দেখে-দেখে তাঁকে আমার মনে হ'তো যেন পুরাণের এক বিরাট ভয়ংকর দৈত্য—নিম্নলোকের কোন অদৃশ্য অন্ধকার থেকে উঠে এসেছেন কোন মহৎ সর্বনাশের জন্য।

৬

এই দীর্ঘ, শ্বেত-পীত, অসংবৃত মূর্তি দেখে প্রথম ধাক্কায় অপর্ণা-দি কী ভেবেছিলেন তা আমি বলতে পারবো না। তবে এটুকু মনে হয় যে আমার মনে রহস্য-মেশানো যে-আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছিলো, সেটা তাঁর হয়নি। দুর্দম পশু-শক্তির দৃশ্যে আমার মতো জন্ম-দুর্বল, কল্পনা-বিলাসী ছেলেরই ভীত হবার কথা, মেয়েদের নয়। জগন্মাতার শ্রীচরণ সিংহের উপর ন্যস্ত ; পশু-শক্তিকে পোষ মানানো স্ত্রী-শক্তির একটা লীলা। আমার তখনও জানতে বাকি ছিলো যে পুরুষের সমস্ত বিশ্বগ্রাসী বিক্রম একটি ছোটো নরম হাতের মুঠির মধ্যে অনায়াসে ধ'রে যায়।

দেখলুম তা-ই। এমন-যে মস্ত দুরন্ত পুরুষ কল্যাণকুমার, তার উত্তপ্ত প্রাণশক্তির অসহিষ্ণু খরস্রোত একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণকায় তরুণীর কাছে এসেই হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়ালো। অপর্ণা-দির সম্মুখীন হ'লে তিনি কেমন-যেন নিবে যেতেন, নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। অন্ধকার-উত্থিত দৈত্যের ভয়ংকরতা মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়ে সোনার চশমার পিছনে দীপ্ত চোখে—কী বলবো?—অন্য রকম একটা দৃষ্টি ফুটে উঠতো। হ্যাঁ, অন্য রকম—তাছাড়া আর-কিছু বলবার নেই। পারতপক্ষে অপর্ণা-দির কাছে ঘেঁষতেন না তিনি—সর্বদা যেন তাঁকে একটু চেষ্টা ক'রেই এড়িয়েই চলতেন। আমাদের বাড়িতে অমন নিবিড় ভাবে মিশে

গিয়েও তাঁর সঙ্গে কোনো বাক্য-বিনিময় কল্যাণকুমার বলতে গেলে কখনোই করতেন না—এক বাড়িতে থেকে, এক জায়গায় ব'সে খেয়ে, প্রত্যহ একজন আর-একজনের শারীরিক উপস্থিতি অনুভব ক'রেও এঁরা দু' জন যেন চিনতেনই না পরস্পরকে। কল্যাণকুমার আমার সঙ্গেও বড়ো-একটা কথা বলতেন না—পাশের ঘর থেকে কোনো বই নিয়ে আসবার কি ডাকবাক্সে কোনো চিঠি ফেলে' দেবার ফরমাশ করা ছাড়া: আমি তখন পর্যন্ত ছেলেমানুষের দলে, আমার প্রতি তাঁর এ-অবজ্ঞা আমি স্বাভাবিক ব'লেই মেনে নিয়েছিলুম। আর অপর্ণা-দিকে তিনি আমার চেয়েও কম লক্ষ্য করতেন: তাঁকে যেন তাঁর চোখেই পড়ে না। তিনি যখন বারান্দায় পাইচারি করতে-করতে বই পড়েন, তখন অপর্ণা-দি যদি তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে যান, একবার চোখ তুলে তিনি তাকিয়ে পর্যন্ত দেখেন না। কিন্তু কিছুদিন যেতেই বুঝতে পারলুম তাঁকে কী কঠিন চেষ্টা করতে হয়েছে সেই না-তাকাবার জন্য; বুঝতে পারলুম, অপর্ণা-দিকে যে তিনি বেশি লক্ষ্য করছেন না, তাতেই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা হচ্ছে।

খুব বেশি দিন গেলো না, লক্ষণগুলি ক্রমেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো। কল্যাণকুমারের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে অপর্ণা-দি যেন আর চান না; তিনি বাড়ির যে-অংশেই থাকুন, অপর্ণা-দি কী ক'রে যেন অন্য-কোনো অংশে থাকবার ব্যবস্থা করেন। বেশির ভাগ সময় একাই থাকেন অপর্ণা-দি, কথা

বলেন কম, আমিও চ্যুত হলুম তাঁর বিশ্বাসভূমি থেকে। তবু আমার চোখ পড়তো: তাঁর চিন্তার অংশ না-পেয়েও আমি লক্ষ্য করতুম, বুঝতে পারতুম তাঁর মুখে, এক নতুন দীপ্তি, যেন তাঁর ভিতরে জ্ব'লে উঠেছে কোনো আলো। সে-দীপ্তি নিছক সৌন্দর্যের নয়; অন্তরের কোনো গোপন উত্তাপ মুখে ফুটে উঠছে ছোটো-ছোটো বিদ্যুৎ-শিখায়। তাঁর চলাফেরার শান্ত কোমলতায় নতুন একটা শক্তির চেতনা, নিহিত কোনো গোপনতার গৌরব। কখনো-কখনো—আমি হয়তো তাঁর কাছে ব'সে আছি, তিনি আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে থাকতেন—এতক্ষণ ধ'রে, যে আমি বুঝতে পারতুম, তিনি মোটেও আমার দিকে তাকিয়ে নেই, আমার মুখ খানিকটা শাদা কাগজ, যার উপর তিনি লিখে যাচ্ছেন তাঁরই মনের কোনো গোপন কথা। একদিন হঠাৎ তাঁকে দেখে ফেলেছিলুম—রাত্তিরে শোবার আগে পিঠের উপর চুল খুলে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন—স্থির, গভীর দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকিয়ে, যেন নিজেকে এই প্রথম দেখছেন। তাঁর চুলের গন্ধে সমস্ত ছোটো ঘরটি ভ'রে গিয়েছিলো। এখনো, কোনো মধ্যরাত্রে, হঠাৎ কোনো দমকা হাওয়ায়, সেই গন্ধ এখনো আমাকে হানা দেয়।

আর কল্যাণকুমার—আত্মোন্নতিতে, উচ্চচিন্তায়, দেশের কল্যাণে, মানবের মুক্তিতে তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ কী-রকম যেন শিথিল, অসংলগ্ন হ'য়ে আসতে লাগলো; সব সময় তিনি যেন

কিসের প্রতীক্ষা করছেন, শঙ্কিত হচ্ছেন কী-কথা ভেবে। সব সময় তিনি যেন অনুপস্থিত। বাইরে থেকে দেখতে, তিনি আগের মতোই পড়ছেন, কথা বলছেন, তর্ক করছেন, কিন্তু অন্য একটা শক্তি সেই বিশাল অবয়বকে আঁকড়ে ধরেছে, ভিৎ ন'ড়ে উঠেছে যেন। এমনকি, কথা বলতে-বলতে হঠাৎ তিনি চুপ ক'রে যান, কিছু না-ক'রে, চুপ ক'রে ব'সে থাকেন মাঝে-মাঝে, যে-আশ্চর্য ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। কখনো বা পাইচারি করতে-করতে গুনগুন গান করেন—তখনকার দিনে ফ্যাশনের চরম, আজকের দিনে বিস্মৃত কোনো গান। খাওয়ার পর, অপর্ণা-দিকে মাঝে-মাঝে পান দিয়ে আসতে হ'তো তাঁকে; ডিবেটা তাঁর সামনে রেখে, কোনো দিকে না-তাকিয়ে অপর্ণা-দি আস্তে-আস্তে চ'লে যেতেন; আর কল্যাণকুমার তাড়াতাড়ি তিনটে পান একসঙ্গে ভ'রে ফেলতেন মুখের মধ্যে, তারপর বসতেন কোনো বই নিয়ে, কিন্তু তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যেতো তিনি পড়ছেন না। কিছু, কিছু-একটা ঘটেছে; এখনো অদৃশ্য, এখনো প্রচ্ছন্ন: কিন্তু আর দেরিও নেই, ঐ তো তার ছায়া, তার হাওয়া, আর হাওয়ায় বিদ্যুতের সঙ্গে বিদ্যুতের ঘর্ষণ।

৭

আমার বিশ্বাস, আমার নামকরণের সময় বাবা একটু অন্যমনস্ক ছিলেন—না কি, হঠাৎ তাঁর হাস্যরসবোধ ঝিলিক দিয়ে উঠেছিলো? যে-ঘোরতর নীলিমা আমার সর্বাঙ্গের, তা শুধু আমার কণ্ঠে আরোপ ক'রে তিনি আমার নাম রেখেছিলেন নীলকণ্ঠ। ব্যবহারে সেই সামান্য ভ্রমটুকু সংশোধিত হয়েছিলো: বাড়ির সবাই আমাকে ডাকতেন নীল।

এক বিকেলে হঠাৎ কল্যাণকুমার আমাকে বললেন: 'নীল, বেড়াতে যাবে?'

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। ঐই দৈত্যতুল্য মানব—এতদিন যাঁর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আজ্ঞা পালন ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করেছি, যিনি রহস্যময়, যিনি ভয়ংকর, যাঁর মধ্যে বন্যার বেগ ও কলরোল, যাঁর বহুমুখী আত্ম-প্রয়োগ তাঁকে এক মুহূর্তের সময় দেয় না—তিনি কিনা আমার কাছে এসে নিতান্ত সহজ, সাধারণ মানুষের মতো জিগেস করেছেন আমি বেড়াতে যাবো কিনা!

'চলো না একটু বেড়িয়ে আসি', তিনি আবার বললেন।

'কোথায়?' তখনও বিমূঢ়, তখনও অজাতবিশ্বাস, আমি প্রশ্ন করলুম।

'কোথায় যাবে, বলো!' কল্যাণকুমারের একখানা বিশাল

থাবা আমার কাঁধের উপর এসে পড়লো, 'ময়দানে চলো—ইডেন গার্ডেনে চলো ব্যাণ্ড শুনি গে। তুমি তো দেখি মোটে বাড়ি থেকেই বেরোও না। বিকেলে ঘরে ব'সে থাকলে কি শরীর ভালো থাকে?' তিনি আমার কাঁধ ধ'রে তাঁর বিবেচনায় মৃদু একটু ঝাঁকুনি দিলেন। আর-একটু হ'লেই আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম প্রায়।

মা একটু দূরে ব'সে ছিলেন, আমি তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, 'যা না, বেশ তো। কুনো হ'য়ে থাকতে কী ভালোই যে লাগে তোর।'

নিঃশব্দে তিরস্কার হজম ক'রে তৈরি হবার জন্য উঠে গেলুম। মনে-মনে একটু ফুর্তি, একটু উত্তেজনাও যে অনুভব না-করছিলুম তা নয়। ময়দান, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি জায়গা তখনও আমার মনে রোমাঞ্চময়; ও-সব জায়গায় খুব কমই যাতায়াত ছিলো আমার। মা আমাকে একা ছাড়তে চাইতেন না, আর মাতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমি কখনো বিদ্রোহ করিনি, প্রয়োজন বোধ করিনি তার—এখন বুঝতে পারি, কেন। শৈশবে মা-র আদেশ অমান্য ক'রে বিদ্রোহের শক্তি নিঃশেষ ক'রে দিলে চলতো না আমার। আমার সে-শক্তি সঞ্চিত হ'য়ে ছিলো পরবর্তী জীবনের কঠিন বিদ্রোহের জন্য—সমাজের অন্ধ শক্তির বিরুদ্ধে, সম্মিলিত গণ-ইচ্ছার নিশ্ছিদ্র মূঢ়তার বিরুদ্ধে। শিশুকালে আমার উপর নির্দেশ ছিলো মা-কে না-ব'লে কখনো যেন রাস্তায় না-বেরোই: তা আমি পালন করেছি অক্ষরে-অক্ষরে। এত দূর, যে গলির

মোড়ের ছোটো মনোহারি দোকানে পেনসিল কিনতে যেতে হ'লেও মা-কে না-জানিয়ে যাত্রা করতুম না। আর বেরোতে আমার বেশি ইচ্ছেই করতো না, আমার ভালোই লাগতো বাড়ি ব'সে থাকতে, বাইরের জগৎটাকে মনে-মনে কল্পনা ক'রে নিতে। আমরা থাকতুম হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি একটা গলিতে। শৈশবে আমার বিশ্বের সীমা ছিলো সেই গলির মোড়, আর গলির মোড়ের মনোহারি দোকানেই ঐশ্বর্যের বিলাস সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা। এত আশ্চর্য ও অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী যে-দোকানি তাকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতুম, ঈর্ষা করতুম। জানতুম, সেই গলির পর বড়ো রাস্তা, সেখানে ট্র্যাম চলে, তারপর আর-কিছু জানতুম না। না-জানতেই ভালো লাগতো। ভালো লাগতো ভাবতে। তারপর ইশকুল, ইশকুলের পর কলেজ, দুটো পাশাপাশি, দুটোই বাড়ির কাছে। সেটুকু রাস্তা জয় ক'রে ফেললুম অনায়াসে। বড়ো রাস্তা, যেখানে ট্র্যাম চলে, তা আর রহস্য রইলো না : কিন্তু রইলো বিশাল উতরোল শহর, আমার মনে অস্পষ্ট, ছায়াময় ; কল্পনায় সীমাহীন। জন্ম থেকে যদিও কলকাতায় আছি, আর তখন আমার বয়স ষোলো, তবু তখনও আমি তার পথ-ঘাট ভালো চিনতুম না। আশ্চর্য নয়, ময়দানে যাবো মনে করতে আমি-যে রোমাঞ্চিত হলুম।

বেরিয়ে পড়লুম কল্যাণকুমারের সঙ্গে। ট্র্যামে চ'ড়ে চৌরঙ্গি, তারপর অপরাহ্ণ-উজ্জ্বল ময়দান, সরকারি বাজনা,

গঙ্গার উপর জাহাজের মোটা-মোটা চোঙার ঠেলাঠেলি, বরফ-লেমনেড খাওয়া—কী নয়? সে-বিকেলের কথা মনে করতে আজও আমার ভালো লাগে। আমি বিস্মিত, মুগ্ধ, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছিলুম শিশুর মতো। কল্যাণকুমার আমার সঙ্গে নানারকম আলাপ করলেন—কলেজ আমার কেমন লাগে, কী-বই পড়তে আমি ভালোবাসি, শেক্সপিঅরের কোন চরিত্র হ'তে পারলে আমি সবচেয়ে খুশি হই, সুরেন বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা আমি শুনেছি কিনা। তিনি যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে আমিও একটা আস্ত, জ্যান্ত মানুষ; আমারও ভালো লাগে, মন্দ লাগে; ইচ্ছা, আশা, চেষ্টা, জল্পনা আছে আমারও। প্রায় সমকক্ষের মতো তিনি কথা বললেন আমার সঙ্গে: গর্বে আমি ফেটে পড়লুম।

এর পর থেকে, কল্যাণকুমারের জগতে আমি, বাড়ির মধ্যে কনিষ্ঠতম, নিরীহতম, তুচ্ছতম, সর্বদা আত্মগোপনে সচেষ্ট, আত্মবিলোপে উৎসুক, আমিই হ'য়ে উঠলুম সর্বপ্রধান ব্যক্তি। আমাকে তিনি উদ্ব্যস্ত ক'রে তুললেন অত্যধিক মনোযোগে, অপ্রার্থিত, অফুরন্ত আদরে। আমার স্বাস্থ্যের জন্য, সুখের জন্য, চিত্তবিকাশের জন্য ভাবনার শেষ নেই তাঁর। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবার যিনি কখনো সময় ক'রে উঠতে পারেননি, সেই ব্যক্তি আমার দৈহিক আরাম আর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যসাধনে উঠে-প'ড়ে লাগলেন। আমি বড্ড বেশি পড়াশুনো করি, আমার জন্য বিশেষরকম আহারের প্রয়োজন:

কল্যাণকুমারের আদেশে মা আমার জন্য সকালে একটা অর্ধসিদ্ধ ডিমের আর বিকেলে ছানার সন্দেশ আর বিবিধ পশ্চিমি ফলের ব্যবস্থা করলেন। আমি বড়ো হয়েছি, আমাকে আর খাটো হাতার গলাবন্ধ কোট পরলে মানায় না: আমার জন্য এলো—কল্যাণকুমার নিজেই আনলেন—সাহেব-বাড়ি থেকে ডজনখানেক শেক্সপিরিয় কলার আর হাতাওলা মুড়মুড়ে শক্ত শার্ট। বলা বাহুল্য, এই বিশেষীকরণে আমি অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে পড়লুম: সেই ডিম, ছানার সন্দেশ আর আঙুরের চাইতে মাতৃতন্ত্রের চিঁড়েভাজাই আমার ভালো লাগতো; সেই অতি-শুভ্র, অতি-শক্ত শার্ট প'রে আমি ঘোরতর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতুম—সেটা অবশ্য এমনিও করতে পারতুম (বাঙালির সাজসজ্জার গ্লানিটি অপেক্ষাকৃত হাল আমলের ঘটনা)। এতেও অতৃপ্ত, কল্যাণকুমার আমার মানসিক সংগঠনের ভার নিলেন: মিল্টন পড়লেন আমাকে নিয়ে ব'সে, আমাকে দিয়ে 'বটমের চরিত্র, মনুষ্যত্বের অধিকার, বীরত্বের সংজ্ঞা, এ-সব বিষয়ে রচনা লেখালেন, নিজে যে-সব প্রবন্ধ লিখছেন তা নিয়ে আলোচনা করলেন আমার সঙ্গে। আমার সুশিক্ষা যেন তাঁরই দায়িত্ব—আর মোটের উপর তাঁর ব্যবহার এমন যেন সত্যি-সত্যি আমার মন পরিণত ও সুশিক্ষিত—জোর ক'রেই তিনি আমাকে টেনে তুলবেন সেই স্তরে। যখন-তখন তিনি আমাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে বই কিনে দিতেন—যে-কোনো বই আমি চাই, যে-কোনো বই আমার চোখে লাগে—কাগজের সৌরভে

ভরা, কাচের জানলা-লাগানো সেই ঠাণ্ডা ঘরে ঘুরে বেড়াতে কী ভালোই আমার লাগতো—ভয়ে-ভয়ে বইগুলিকে একটু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখতুম—একসঙ্গে সবগুলি নিয়ে যেতে ইচ্ছে করতো, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবো কিছুতেই মনস্থির করতে পারতুম না। 'এটা নেয়া যায় না?' 'নাও না, নাও, এটা নাও।' 'না থাক, ওটাই বোধহয় ভালো।' 'দুটোই নাও, আর কী-কী নেবে ছাখো।' 'আচ্ছা, এই কবিতার বইটা—কি শাল'ট ব্রন্টির—না, এই হলিডে অ্যান্থলজিটা...' এমনি চলতো অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত, মস্ত মোটা প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে-আসতে আমার মন খুঁতখুঁত করতো কেবলই—হয়তো কল্যাণকুমারের বড্ড বেশি খরচ হ'য়ে গেলো; এ-বইটা না-এনে ওটা আনলেই ভালো হ'তো, সবচেয়ে ভালো বইগুলি বুঝি দোকানেই থেকে গেলো। আমার অনুশোচনা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কয়েকদিন পরে কল্যাণকুমারই হয়তো আবার বলতেন: 'এই, নীল, সেদিন-যে ল্যামের এডিশনটা দেখে এসেছিলাম, চলো সেটা আজ নিয়ে আসি।' আমি লুব্ধ, কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত। 'ল্যাম তো বাড়িতে চারখানা রয়েছে।' 'তাতে কী? ও-বইটা কী চমৎকার দেখতে! চলো।' যেতুম: লোভে, লজ্জায়, আনন্দে, অপব্যয়ের চেতনায় পীড়িত আমার মন। এবং, বলা বাহুল্য, শুধু একখানা ল্যাম নিয়েই বাড়ি ফিরতুম না। আমার উপর কল্যাণকুমারের উন্মুক্ত, অজস্র দয়াবর্ষণে আমি বিব্রত, বিমূঢ় হ'য়ে উঠলুম।

আসল কথাটা এই যে সে-সময়ে আমার সান্নিধ্যই

কল্যাণকুমারের ভালো লাগছিলো। কেননা আমি অপর্ণা-দির প্রিয়পাত্র; অপর্ণা-দির মনের আমিই অংশীদার; আমার মধ্যে হয়তো তাঁরই সৌরভের ক্ষীণ সংক্রমণ। আমার মুখে কখনো হয়তো লেগেছে তাঁর নিশ্বাস, তাঁর আঁচল হয়তো কখনো এসে পড়েছে আমার গায়ে। আমি তাঁর দীর্ঘ নিবিড় সঙ্গলাভে পরিপূর্ণ। আমার মধ্যে কল্যাণকুমার তাঁকেই খুঁজতেন, তাঁকেই অনুভব করতেন, তাঁকেই স্পর্শ করতেন। তাঁর যেন বিশ্বাস ছিলো যে আমার উপর বর্ষিত তাঁর প্রতিটি দয়া কোনো রহস্যময় উপায়ে রূপান্তরিত হ'য়ে, পূজা হ'য়ে সেখানেই গিয়ে পৌঁচচ্ছে—শাদা ফুলের অঞ্জলি হ'য়ে ছোটো, শাদা তাঁর পায়ের উপর। এটা আশ্চর্য যে অপর্ণা-দির কাছে নিজেকে সোজাসুজি নিবেদন করতে কখনোই তিনি পারেননি—বাইরের কোনো আব্রু ছিলো না, আব্রু ছিলো তাঁর মনে। কিন্তু খুব আশ্চর্য হয়তো নয়; কেননা নিজের শক্তির তাড়নায় অস্থির এই প্রচণ্ড পুরুষ—যিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন কর্মের উত্তালতায়, জ্ঞানের অতলতায়—তাঁর কাছে স্ত্রীলোক ছিলো একটা রহস্যের অন্ধকার দ্বীপ। তার তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি জানতেন না মেয়েদের হাসি কেমন, কথা কেমন; কেমন তাদের চুলের গন্ধ, ভুরুর টান। সেখানে—সমস্ত বিশ্বে ঐ একটি জায়গায়—বিস্ময়ের পার নেই তাঁর মনে। অপর্ণা-দির সম্মুখীন হ'তে তাঁর—ছ' ফুট লম্বা, ফুটস্তপ্রকৃতি, বহুবাক্‌যুদ্ধজয়ী, চিন্তারণ ক্ষেত্রের নায়ক সেই বীরের ঠিক সাহস হ'তো না।

আমি ঠিক জানি, অপর্ণা-দির দিকে তাকিয়ে তিনি ভীত হ'য়ে পড়তেন, আমার মনে যেমন আতঙ্ক হ'তো কল্যাণকুমারকে দেখে। হাতের কাছে ছিলুম আমি; তিনি আঁকড়ে ধরলেন আমাকেই। স্বীকার করবো, এই পরোক্ষ কোর্টশিপের চাপে আমি রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছিলুম।

খুন চাপা রইলো না। অনিবার্যরূপে, তা ফেটে বেরোতে লাগলো; আর উপায় নেই ভুল করবার। মা হঠাৎ সচকিত হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। চলতে লাগলো আমাদের অভ্যস্ত জীবন, যেন কিছুই লক্ষ্য করবার নেই।

তারপর আর সেটুকু আড়ালও টিঁকলো না। কল্যাণকুমার মরীয়া হ'য়ে উঠলেন; ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সমুদ্রে। জল ছিটকে এসে লাগলো আমাদের অনেকেরই গায়ে।

কোথায় গেলো তাঁর সভা আর তর্ক, মিল্টন আর ভারতের ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ, তাঁর রাশীকৃত বিদ্যা আর কর্মের উদ্বেলতা। আর কোথায় বা গেলাম আমি। সব মুছে গেলো। সকালে আমি ডিম খাচ্ছি কিনা, বিকেলে ব্যায়াম করছি কিনা, এ-সব জরুরি খবরে আর তাঁর আগ্রহ নেই; এমনকি, আমার আর নতুন বইয়ের দরকার আছে কিনা, তা পর্যন্ত তিনি জিগেস করেন না একবার।

আমি নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু ঝক্কিটা গিয়ে পড়লো মা-র উপর। বেচারা মা—সে-সময়টায় বেশ-একটু বিপন্নই হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। কেননা কল্যাণকুমার নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত

করলেন তাঁর দিদির সঙ্গে। সব সময় তিনি আছেন তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে—কথা বলছেন, এখন আর সেই গম্ভীর উচ্চস্বরে নয়, অত্যন্ত মৃদুস্বরে, চুপে-চুপে, ছেদ নেই কথায়, শেষ নেই কথার। সে-সব আমরা শুনতে পেতুম না, কিন্তু বিষয়টা অনুমান করবার জন্য অসাধারণ বুদ্ধিমান হ'তে হয় না। মা-র দিবানিদ্রা ঘুচলো, রাত্রির ঘুমও যায়-যায়। তিনি খেতে বসেছেন—কল্যাণকুমার এসে বসলেন তাঁর কাছে মেঝের উপর। রান্না করছেন, দোরগোড়ায় উব-হাঁটু হ'য়ে ব'সে কল্যাণকুমার। এক মুহূর্তের শান্তি তিনি তাঁকে দিতেন না। মা সান্ত্বনা দিতেন, আশ্বাস দিতেন—আর নিশ্চয়ই মনে-মনে হাসতেন—এই সুবৃহৎ শিশু, কী সহজে পোষ-মেনে-যাওয়া এই অন্ধ ঝড়কে দেখে। আর নিশ্চয়ই সঙ্গে-সঙ্গে, তাঁর বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগতো, হয়তো জল আসতো চোখে। এতদিনে সময় এলো। আর অপর্ণাকে রাখা যাবে না।

৮

কল্যাণকুমার অতটা তোলপাড় করেছিলেন তাঁর স্বভাবে, প্রয়োজনে নয়। সহজেই সেটা হ'তে পারতো, আর সহজেই হ'লো এবিয়েতে আপত্তির আর কথা কী। মা-র চিঠির উত্তরে কাকাবাবুর টেলিগ্রাম এলো: 'সব ঠিক ক'রে ফ্যালো।' চিঠি লেখবার সময় তাঁর কোথায়; পাত্র সম্বন্ধে যে-সব খবর মা জানিয়েছিলেন, তার বেশি আর জানবারই বা দরকার কী। বৌদি যখন ঠিক করেছেন—ঠিক আছে। কাকিমার এক সকৃতজ্ঞ চিঠি এলো কয়েকদিন পরে: 'আপনি আমাদের যে-উপকার করলেন,' ইত্যাদি। তিনি সত্যি খুশি হয়েছিলেন: তখনকার দিনে গ্র্যাজুয়েট মানে ছিলো মহাপুরুষ। আর কল্যাণকুমার—মা-যদি বলেন, 'তুমি তেতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে পারো?' তাহ'লে 'নিশ্চয়ই!' ব'লে তখুনি মাথা নিচু ক'রে সবেগে লাফিয়ে পড়েন—এই তাঁর অবস্থা। উভয় পক্ষের কৃতজ্ঞতায় মা রোদ-পোহাতে লাগলেন। মনে-মনে ভাবলেন, যা-ই হোক, একটা কাজ করলুম জীবনে।

নিখুঁত বিয়ে। সকলেই খুশি। সবচেয়ে খুশি আমার বাবা—তাঁর প্রিয় ছাত্রের সঙ্গে এই আত্মীয়তা—'আমার কেন এটা আগে মনে এলো না তা-ই ভাবি।' মা গোপনে ভাবলেন: 'ভালোই—শ্বশুর-শাশুড়ির আপদ নেই, আর কল্যাণ তো ঘরের

ছেলে—মেয়েটাকে বিসর্জন দিতে হ'লো না।' আমি ঠিক জানি এই ভেবেই তিনি সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন যে তাঁর অপর্ণাকে শেষ পর্যন্ত হারাতে হ'লো না : তাঁর ঠাকুরদের পায়ে বার-বার প্রণাম জানালেন তিনি। কল্যাণকুমারের কথা তো আগেই বলেছি, আর অপর্ণা-দি—তাঁর কথা কিছু বলবার নেই। তিনি হ'য়ে উঠলেন কোনো অজ্ঞাত, রহস্যময় পূজার ধূপদানি—সৌরভের আর শান্তির ধোঁয়ায় অস্পষ্ট।

একদিনের কথা এখানে ব'লে রাখি। বিয়ের তখন দিন সাতেক বাকি। সন্ধের পর কী-একটা বই খুঁজতে-খুঁজতে আমি ঢুকে পড়েছিলুম অপর্ণা-দির ঘরে। ও-সময়ে তিনি সাধারণত ঘরে থাকেন না, ঘর অন্ধকার। দরজা দিয়ে ঢুকেই আমি হাত বাড়িয়ে আলো জ্বাললুম। সঙ্গে-সঙ্গে অস্ফুট একটা শব্দ হ'লো। ফিরে তাকিয়ে দেখি, অপর্ণা-দি শুয়ে আছেন তাঁর ছোটো লোহার খাটে, হাত দিয়ে চোখ আড়াল করেছেন আলো থেকে। আমি অপ্রতিভ হ'য়ে বললুম, 'দীনবন্ধু মিত্রটা কি তুমি এনেছিলে, দিদি ?'

'হ্যাঁ, ঐ তো টেবিলের উপর।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে অপর্ণা-দি চোখ দুটো রগড়ে নিলেন একবার। আমার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখের উপর গিয়ে পড়লো। এক ঝলকে আমি বুঝে ফেললুম যে একটু আগে তিনি কাঁদছিলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চোখ বুজলেন : বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি বুঝেছি।

বইটা নিয়ে দরজার কাছে এসে আমি আলো নেবাতে যাচ্ছি, অপর্ণা-দি চোখ মেলে বললেন, 'যেয়ো না, নীল।'

'তুমি ঘুমোও', আমি বললুম, 'আমি যাই।'

'এই সন্ধেবেলায় নাকি কেউ ঘুমোয়! শোনো।'

আদেশ। তবু সন্দিগ্ধ, আমি গিয়ে দাঁড়ালুম তাঁর কাছে। খাটের ভিতরের দিকে একটু স'রে গিয়ে বললেন, 'বোসো।'

বসলুম তাঁর পাশে। চোখ ফিরিয়ে নিলুম অন্য দিকে, কেননা তাঁর মুখ, অশ্রু-উজ্জ্বল তাঁর চোখ, ক্লান্তিতে এলায়িত তাঁর শরীর—মধুর, এত বেশি মধুর যে আমি যেন অস্বস্তি বোধ করছিলুম।

'নীল, তোমাকে যে আজকাল দেখতেই পাই না।'

জবাব দিলুম না। কী বলবো? কল্যাণকুমার আসবার পর থেকে অপর্ণা-দি আস্তে-আস্তে স'রে গিয়েছিলেন আমার জগৎ থেকে—না, আমিই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলুম ভবিতব্যকে পথ ছেড়ে দিয়ে।

অপর্ণা-দি একটু তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।—'মনে হচ্ছে কতকাল পর দেখলুম তোমাকে।'

'তোমার শরীর কি ভালো নেই?' কিছু-একটা না-বললে ভালো দেখায় না ব'লেই এই প্রশ্ন।

'আমার তো কিছু হয়নি। তোমাকেই যেন ভালো দেখছি না?'

আমি চুপ; একটু চুপচাপ কাটলো। অপর্ণা-দি আবার বললেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

'বাঃ হবে আবার কী ?'

'আমার কী হয়েছে, জানো ? এমন মন-খারাপ লাগে—'

'তা বুঝতে পারছি, তা বুঝতে পারছি,' আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম, পাছে এর পরে এমন-কোনো কথা তিনি বলে ফেলেন, যার জন্য পরে অনুশোচনা করতে হয়।

'একটু আগে আমার খারাপ লাগছিলো—' হঠাৎ থেমে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'নীল, তুমি আমার মন ভালো ক'রে দিতে পারো না ?'

তখন আমি বললুম, 'এক-এক সময় মন-খারাপ ক'রে থাকা তো বেশ ভালো।'

অপর্ণা-দি একটু হেসে চোখ বুজলেন। তারপর আমি বললুম : 'দিদি, এ তো আনন্দের।'

হঠাৎ আমার কাছে স'রে এসে অপর্ণা-দি দু'হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন আমার হাত। খুব আস্তে-আস্তে বললেন, 'আমার এমন ভয় হয়—এমন ভয় হয়, নীল, পাছে আমি ম'রে যাই।'

৯

তখন বর্ষাকাল, বিয়ের তারিখ পড়েছে শ্রাবণ মাসে। আয়োজন চলছে পুরো দমে ; কাকিমা তাঁর ছেলেদের নিয়ে শিগগিরই এসে পড়বেন।

একদিন মা বললেন, 'কল্যাণ, তোমার আত্মীয়-স্বজনরা কে-কে আসবেন, বলো।'

কল্যাণকুমার তাঁর ঘন চুলগুলিকে কপাল থেকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আত্মীয়-স্বজন ? কই, কাউকে তো দেখি না।'

'সে কী! কেউ না-এলে কি চলে ?'

'এত দিন চলতে পারলো', কল্যাণকুমার যেন চ'টে উঠলেন, 'আর এখন চলবে না ? তোমরা আছো কী করতে ?'

'আমরা থাকলেই হবে ?'

'হবে না! খোঁজখবর করলে দু'একজন জ্যাঠামশাই কি পিসিমা কি বের করতে না পারি, ভেবেছো ? কিন্তু কে যে কোথায় থাকেন!—আমার এক জ্যাঠামশাই—বাবার খুড়তুতো ভাই—দু' বছর আগে নেত্রকোণায় ছিলেন—এখন হয়তো সিরাজগঞ্জ কি চাঁদপুর কি উলুবেড়েতে—কি কক্সবাজার কি রাঙামাটি হ'লেই বা দোষ কী।'

মা হেসে ফেললেন।—'কী ছেলে ছাখো! এমন চমৎকার আত্মীয়বাৎসল্য কে কবে দেখেছে!'

'আত্মীয়!' পাইচারি করতে-করতে বলতে লাগলেন কল্যাণকুমার। 'আত্মীয় মানে কী? ও তো একটা কথা। দৈব যাকে আত্মীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এনে ফেলেছে, সে যেমনই হোক, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হবে—আমরা, আধুনিক সভ্যতার মানুষ, আমরা কেন এ-অত্যাচার সইবো? তুমি যদি অমন চমৎকার মাছের ঝোল আর ডিমের ডালনা রান্না করবার ফাঁকে দু' একখানা বই পড়তে, দিদি, তাহ'লে তুমি বুঝতে যে ও-সব আত্মীয়তা-টাত্মীয়তা হচ্ছে মানুষের বর্বর অবস্থার একটা ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ—সেই সময়কার, মানুষ যখন গুহায়, জঙ্গলে ছোটো-ছোটো দল বেঁধে বাস করতো—'

'বুঝেছি', মা হাসলেন। 'তা কথাটা হচ্ছে—'

'না, শোনো, বলতে দাও আমাকে। তুমিই বা অমন আত্মীয়-আত্মীয় ক'রে মাথা ঘামাচ্ছো কেন, বলো তো? বিশ্বসুদ্ধ সবাই আমার আত্মীয়। সবাইকে ডেকো বিয়েতে। যাকে ভালো লাগে, সে-ই তো আত্মীয়। যাকে ভালো লাগে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে কতক্ষণ।'

মা মুচকি হেসে বললেন, 'তোমার বেলায় তো তা-ই দেখলুম। তা যা-ই হোক, তোমার দিকের কাউকে তো আসতেই হবে।'

'দিক আবার কী? আর সে-কথাই যদি বলো, তুমিই তো আমার দিকের।'

'আমি তো আছিই। তা ছাড়া?'

হঠাৎ পাইচারি থামিয়ে কল্যাণকুমার ব'লে উঠলেন, 'ওঃ-হো!'

'কী হ'লো?'

'বা, আমি আছি কোথায়? মায়া! মায়া আসবে না?'

'মায়া কে?'

'মায়া—আমার বোন!'

'তোমার বোন!'

'কেন, আমার কি একজন বোনও থাকতে নেই নাকি?'

'কী আশ্চর্য! এ-কথাটা একবার বলতে হয় না? তোমার বোনকে লিখে দিয়েছো?'

'লিখবো আবার কী?'

'লেখোনি?'

'লিখবো কেন? ও তো এখানেই।'

'এখানেই? কোথায়?'

'কোথায় আবার—বেথুনের হস্টেলে।'

'হস্টেলে! পড়ে নাকি?'

'পড়ে কিনা জানি না, তবে পড়বার তো কথা, পড়বে ব'লেই তো দিয়েছি ওখানে।'

'কবে থেকে আছে?'

'কবে থেকে? ওঃ—বরাবরই তো।'

মা স্তম্ভিত হ'য়ে এই উন্মত্ত যুবকের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'কী কাণ্ড! তোমার বোন—আর এতদিনের মধ্যে একদিন নিয়ে আসোনি!'

'তোমরা বলেছো কখনো নিয়ে আসতে ?'

এর পর মা অবশ্য বাক্যহারা হলেন। কল্যাণকুমার প্রায় আপন মনেই বলতে লাগলেন, 'তাই তো, মায়ার কথা আগেই ভাবা উচিত ছিলো আমার—কালই ওকে খবর দিয়ে আসতে হয়—কালই বা কেন—আজই, এক্ষুনি !'

'ওর সঙ্গে কি তুমি দেখাও করো না কখনো ?'

'বাঃ, তুমি আমাকে মনে করো কী ? মাঝে-মাঝে যাই বইকি শনিবারে। বেশি গেলেই বুঝি হ'লো ? সময়ের দাম নেই ?'

'তা তো বটেই। এত কথা বলতে হয় যে অন্য-কিছু করবার সময় কোথায় ?'

কল্যাণকুমার উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।—'তুমি যতই চেষ্টা করো, দিদি, আজ আমাকে কিছুতেই রাগাতে পারবে না।'

'বোনকে তুমি এখনো বলোনি বিয়ের কথা ?'

'আবার আলাদা ক'রে বলতে হবে নাকি—বিয়ে হ'লে তো দেখবেই।'

'বিয়ের আগে তুমি বৌ দেখে ফেললে, আর ও বুঝি বৌদি দেখবে না ?'

'বেশ ! নিয়ে আসবো একদিন।'

'বাঃ—এই যে বললে আজই—এক্ষুনি যাবে ?'

'তা—তা—' মাথা চুলকোতে-চুলকোতে হঠাৎ জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন কল্যাণকুমার। 'আজ কী ক'রে হবে—শনিবার ছাড়া তো দেখা হয় না !'

'কালই তো শনিবার !' মা ব'লে উঠলেন। 'কাল যেয়ো।'

আর পরের দিন সকাল থেকে এমন তাড়া দিতে লাগলেন যে কিছুক্ষণের জন্য দিদির আঁচল ছেড়ে বেরোতেই হ'লো কল্যাণকুমারকে।

মায়া এলো সন্ধেবেলায়। শাদার উপর খয়েরি বুটি-তোলা ঢাকাই শাড়ি-পরা একটি মেয়ে, মাঝারি লম্বা, মাঝারি দেখতে, কৌতূহলে লজ্জায় মেশানো চোখের দৃষ্টি—কল্যাণকুমারের স্তম্ভতুল্য আকৃতির পিছন-পিছন উঠে আসছে আমাদের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে—এই আমি তাকে প্রথম দেখলুম, এ-গল্পের সঙ্গে অমন সূক্ষ্মভাবে যে জড়িয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তার কথা এখন থাক। আগে বিয়ের গোলমাল শেষ হোক।

বিয়েটা বেশ জমকালোই হয়েছিলো—ব্রজমোহন অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি। বর তখনকার দিনের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু নাম-করা, এবং কন্যা যাকে বলে 'সুন্দরী'। তাছাড়া বাবার নামের কিছুটা মর্যাদা ছিলো : শহরের শ্বেত কৃষ্ণ সেরা লোকদের অনেকেই নিমন্ত্রণরক্ষা করেছিলেন। আর তার উপর, বিয়েটায় 'লভ'-এর একটু গন্ধ ছিলো ব'লেও হৈ-চৈ হ'লো খানিকটা। ইংলিশম্যান আর হিন্দু পেট্রিঅটে বিয়ের বিস্তৃত রিপোর্ট বেরলো; হিতবাদী ছি-ছি করলো। মোটের উপর মন্দ না ব্যাপারখানা। কাকাবাবু স্বর্গ হাতে পেলেন। জামাতাকে তিনি বোধহয় কোলে নিয়ে নৃত্য করতেন, যদি না

জামাতার শরীরের বৈরাট্য গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত করতো বিয়ের ঠিক আগের দিন তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে হাজির— অনেক চেষ্টা ক'রেও আগে আসতে পারেননি—'উঃ, এত কাজ। নাঃ, এইবার আমি ছেড়ে দেবো, সব ছেড়ে দেবো [illegible] কিন্তু এণ্ডি-মুগার ব্যবসাটা নতুন ধরেছেন তখন, কাজেই [illegible] দিনের বেশি থাকা হ'লো না। আর সে-চারদিন তাঁর কল[illegible] ছাপিয়ে উঠলো বিয়ে-বাড়ির সমস্ত কোলাহল। যাবার দিন তিনি কল্যাণ-কুমারকে উদ্দেশ্য ক'রে আর্দ্রস্বরে একটি ছোটোখাটো বক্তৃতা দিলেন, অপর্ণা-দিকে জড়িয়ে ধ'রে অশ্রুবিসর্জন করলেন মিনিটখানেক—তারপর তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে-মুছতে উঠে বসলেন গিয়ে গাড়িতে ; আবার আসাম তাঁকে গিলে ফেললো।

মায়া

৯

মা জিগেস করলেন, 'অপর্ণাকে নিয়ে কি তুমি দেশে যাবে?'

'দেশ! দেশ কোথায়? যখন যেখানে থাকি, তা-ই আমার দেশ।'

'তবু—বৌ নিয়ে একবার যাবে না? একবার ও দেখে আসবে না ওর বাড়ি?'

'ওর বাড়ি, দিদি', কল্যাণকুমার কোঁচার খুঁটে একবার চশমাটা মুছে নিলেন, 'ওর বাড়ি একটা দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। অত্যন্ত পুরোনো, অত্যন্ত সেকেলে, অত্যন্ত প্রকাণ্ড—বসবাসের অযোগ্য। ও-বাড়ির অদৃষ্টে যা আছে, তা-ই হবে; ও নিয়ে আমি আর দুশ্চিন্তা করি না। কে থাকতে গেছে ওখানে? কী হবেই বা ওখানে গিয়ে? যদি ভূতে বিশ্বাস করো—'

মা বললেন, 'বেশ তো, যদি ইচ্ছে না করে, না-ই বা গেলে।'

'না, শোনো, শেষ করতে দাও কথাটা। ঈশ্বরের এ কী অদ্ভুত বিধান যে মেয়েরা কখনো কোনো কথা শেষ পর্যন্ত শুনতে পারে না। শোনো: যদি ভূতে বিশ্বাস করো, তাহ'লে অবশ্য বাড়িটা সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। অনেক মৃত্যু হয়েছে ও-বাড়িতে। প্রেতলোকের আইন-কানুন অনুসারে সেই সব মৃতদের আত্মার ওখানেই বিচরণ করা উচিত। সত্যি বলতে, বাড়িটার চেহারাই একটু ভূতুড়ে। শেষ সেখানে মারা গেছেন

আমার পিসিমা—তিনি আমাকে মানুষ করেন। বারো বছর বয়সে বিধবা হ'য়ে তিনি ও-বাড়িতে আসেন; বারো থেকে তিরাশি বছর পর্যন্ত ওখানে বাস ক'রে—কোনোরকম রোগে না-ভুগে, নিছক বয়সের চাপে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আর বাড়ি যাইনি। বাড়ি গেলে তাঁকে দেখতে পাবো না, এ-কথা কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। আমি প্রায় নিশ্চিত জানি যে আজ যদি যাই, তাঁকেই দেখতে পাবো সবার আগে।'

মা কল্যাণকুমারের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাড়িটা এখন তাহ'লে একেবারেই খালি প'ড়ে আছে?'

'যদি না', জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতগুলি খুচরো পয়সা সশব্দে নাড়াচাড়া করতে-করতে কল্যাণকুমার বললেন, 'যদি না সেখানে ভূতেরা বাসা নিয়ে থাকে। আশ্চর্য নয় সেটা। আমার মা মারা যান, আমার যখন ছ' বছর বয়স। অস্পষ্ট মনে পড়ে। মায়াকে হঠাৎ এক-এক সময় দেখলে যেন—চমক লাগে। মায়া তখন শিশু। যে-ঘরটায় তিনি থাকতেন—সেই ঘরেই তিনি মারা যান—তার দরজার তালা অনেকদিন খোলা হয় না। তাঁর সব জিনিশপত্তর ঠিক যেখানে যেমন ছিলো, তেমনিই আছে। কেউ হাত দেয়নি। হাত পড়েছে শুধু সময়ের। নিশ্চয়ই সেখানে পুরু হ'য়ে জ'মে উঠেছে ধুলো। আমি ভাবি, সেই ঘরটা, সেই সব জিনিশপত্তর—তারা নিশ্চয়ই মনে রেখেছে তাঁকে। হয়তো মাঝে-মাঝে—কে জানে?—গভীর

রাত্রে চুপে-চুপে তিনি আসেন সেখানে—মুখ দেখেন ঝাপসা আয়নায়। অপর্ণাকে নিয়ে গেলে তিনি হয়তো আর কৌতূহল চাপতে পারবেন না—কোনদিন না বেরিয়েই পড়েন আমাদের সামনে।' কল্যাণকুমার হেসে উঠলেন, 'নাঃ, ও-বাড়িতে না-যাওয়াই বোধহয় ভালো—কী বলো ?'

মা চুপ। কল্যাণকুমারকে এ-ধরনের কথাবার্তা বলতে তিনি এর আগে কখনো শোনেননি। নিজের সম্বন্ধে কোনো কথাই বলতেন না তিনি। তাঁর যেন কোনো অতীত ছিলো না, কোনো অনুষঙ্গ। শূন্যের ভিতর থেকে কোনো আকাশ-ফুলের মতো তিনি ফুটে উঠেছিলেন—আমাদের চোখে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে একটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিলো। বিয়ে ব্যাপারটা একটা স্মারক, আমাদের অচেতন স্মৃতির উদ্রেককারী। বিশেষ, সে-বিয়েতে যদি আমরা সুখী হই। কল্যাণকুমারের হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ কূল ছাপিয়ে গিয়ে পড়েছিলো তাঁর অতীতে, জীবনের অর্ধ-বিস্মৃত অধ্যায়ে, স্মরণের মায়াগৃহে। কাব্য আর ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁকে আর ধ'রে রাখতে পারলো না, আমাদের তিনি অনুভব করতে দিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি।

বাড়ি তিনি গেলেন না, মা মনে-মনে খুশিই হলেন। বিবাহে মিলন, সেই সঙ্গে বিচ্ছেদও। সে-বিচ্ছেদের আঘাত কম নয়। এ-বিয়েতে সেটা রইলো চাপা। অসম্পূর্ণ বিয়ে, বলতে গেলে। উৎসবের শেষে অশ্রুজল পড়লো না, বিদায় দিতে হ'লো না কাউকে। মা খুব খুশি হলেন এ-ব্যবস্থায়। আর

কল্যাণকুমারের হাবভাব দেখে মনে হ'লো তিনিও এতেই তৃপ্ত। স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে লাগলো দিন। আমাদের ছোটো, শান্ত পরিবারের জীবনের স্রোত ব'য়ে চললো, যেমন চিরকাল চ'লে এসেছে। কোনোরকম-যে পরিবর্তন হয়েছে কোথাও, এমন মনে হ'লো না। কোনো-এক দিন কল্যাণকুমার আলাদা বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকবেন—হয়তো—নিশ্চয়ই। কিন্তু তার দেরি আছে। যে-ক'দিন তা না হয়—আমার মা অন্ধ স্নেহে এই মধ্যবর্তী সময়কে আঁকড়ে ধরলেন।

আর এমনি হ'লো যে সেই সময়টা আশাতীতরকম দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা দেখা গেলো। মা-র খুব খুশি হবারই কথা, কিন্তু সে-খুশি অবিমিশ্র নয়। এলো বিচ্ছেদের আশঙ্কা—অন্য পথ ধ'রে। কল্যাণকুমারের মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপলো তিনি বিলেত যাবেন। সে-সময় এম.এ. পড়ছিলেন তিনি। তখনকার দিনে এম.এ.টা রীতিমতোই বিরল ছিলো, কেননা বি.এ. পাশ করবার সঙ্গে-সঙ্গে বাণীর এক-একটি বরপুত্রকে সরকার তাঁর কোনো-না-কোনো উঁচু বেতনওলা চাকরিতে লুফে নিতে চাইতেন। ডেপুটিগিরি সাধা হয়েছিলো কল্যাণকুমারকেও। তিনি তা নেননি, অর্থের তাঁর প্রয়োজন ছিলো না। তাছাড়া, বাবার কাছে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন—অধ্যাপনা ছাড়া কিছু করবেন না জীবনে। সেকালে অধ্যাপকদের মর্যাদা ছিলো। আজকালকার মতো তাঁরা সমাজের

সবচেয়ে স্বল্প-শিক্ষিত শ্রেণী ব'লে বিবেচিত হতেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজে মনোমোহন ঘোষের কণ্ঠ-নিঃসৃত সুইনবর্নের ছন্দ তখন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে ছেলেদের মনে। কল্যাণকুমার মনোমোহন ঘোষের আবৃত্তি শুনেছিলেন : গুরুগুরু বাজের মতো তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো তাঁর মনের মধ্যে। সুইনবর্ন অক্সফোর্ডে ছিলেন, বডলিআনে ব'সে এলিজাবিথান নাটক পড়তেন সারাদিন। অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ডের মতো জায়গা নেই। অক্সফোর্ডেই তাঁকে যেতে হবে, কল্যাণকুমারকে। অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে অধ্যাপকত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিশ্চক্র ; কোনো কলেজের ছায়াময় শীতলতা। ছেলেদের মন উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা, সংহত ক'রে তোলা, জীবনে ও ভাব-রাজ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার প্রতি তাদের মনে ভালোবাসার সঞ্চার করা। এর চেয়ে মহৎ জীবন আর-কী হ'তে পারে? তা ছাড়া, তিনি যথেষ্ট সময় পাবেন, স্বাধীনতা পাবেন—অন্য নানাদিক দিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ, সার্থক ক'রে তোলবার, নানা কর্মের দায়িত্বে নিজের অতিরিক্ত শক্তি খাদে বইয়ে দেবার। না—এর মতো কিছু নয়, এর মতো আর কী হ'তে পারে? অক্সফোর্ড তাঁকে ডাকছে এখন, আর তিনি অপেক্ষা করতে পারেন না। কী লাভ আরো এক বছর ব'সে কলকাতার এম.এ. পাশ ক'রে—ভেসে পড়া যাক, দেরি করা বৃথা। যেদিন থেকে এ-চিন্তা প্রথম কল্যাণকুমারের মনে এলো, তিনি উত্তপ্ত, অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন সেইদিন থেকেই।

বাবা খুশি হলেন। তাঁর ছাত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রকাণ্ড

আশা ছিলো। তিনি সুরেন বাঁড়ুয্যের কথা ভাবলেন, অরবিন্দ ঘোষের কথা ভাবলেন (তিনি তখন বরোদায়)। ইওরোপীয় শিক্ষা না-পেলে শ্রেষ্ঠ কীর্তি অর্জনের, উচ্চতম গৌরব-লাভের যোগ্যতা হয় না, আমাদের দেশের এ-সংস্কার গ'ড়ে উঠছিলো তখন থেকেই। আর তখন পর্যন্ত এ-সংস্কারের সার্থকতা ছিলো; ঠিক সেই সময়টায় পর-পর অসাধারণ ফল ফলেছিলো অনেক। তারই জোরে বিলেতে ভারতীয় ছাত্রের সম্মান ছিলো বহুকাল পর্যন্ত—তারপর দলে-দলে আমাদের নাম ডোবালো অর্ধ-শিক্ষিত ধনী-সন্তান।

বাবা বললেন: 'এ-বছরটা থেকেই যাও না, এম.এ. টা হ'য়ে যাক।'

কল্যাণকুমার প্রবলভাবে মাথা নাড়লেন। না, তা হ'তে পারে না। এই বছরই যাওয়া চাই। এ-দেশে আর মন টিঁকছে না।

মা বললেন, 'এই সেদিন মোটে বিয়ে করলে—'

'তাতে কী হয়েছে? তোমাদের সব কথা! বিয়ে করেছি—সমস্ত জীবনই তো প'ড়ে আছে। দু' তিন বছরে তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

'এক্ষুনি বৌ ফেলে—'

কল্যাণকুমার হেসে উঠলেন।—'দিদি, দিদি, জীবন কি শুধু বৌকে নিয়ে—আরো অনেক-কিছু আছে জীবনে—তুমি কি তা জানো? তাছাড়া অপর্ণা বেশ ভালোই থাকবে তোমাদের

কাছে—আমি তো নতুন—আমার সঙ্গে ক'দিনেরই বা সম্পর্ক।'

মা জিগেস করলেন, 'অপর্ণা কী বলে ?'

'কী আবার বলবে ? তোমার কি মনে হয় ও এ-কথা শুনে কেঁদে ভাসাবে ? ওকে তুমি ও-রকম মেয়ে মনে করো নাকি ?' ব'লে কল্যাণকুমার নিচু গলায় সংক্ষিপ্ত হাসি নির্গত করলেন। তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে একটু ছেলেমানুষি ধরনের গর্ব ছিলো তাঁর মনে। জানি না, এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কী-কথা হয়েছিলো। অনুমান করতে পারি, অপর্ণা-দি ক্ষীণতম আপত্তি করেননি। বরং উৎসাহ দিয়েছিলেন। স্বামীকে অসামান্য ব'লেই জানতেন তিনি। তিনি চাইতেন তাঁকে তাঁর অসামান্যতায় জ্যোতির্ময় ক'রে দেখতে। এই একজন মানুষ, পৃথিবীকে যিনি ভাঙতে পারেন—আবার গড়তে পারেন নতুন ক'রে। তাঁরই তো যাওয়া উচিত বৃহৎ জগতের হৃৎপিণ্ডে, সমস্ত বিশ্ব থেকে রস শোষণ তাঁকে তো করতেই হবে নিজের পরিপূর্ণতার জন্য। নিজেকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলা চাই সবার আগে। অপর্ণা-দি যদি নিজেকে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারেন তাঁর মধ্যে, অন্ধকার-উষ্ণ কোনো সুরার মতো, সঙ্গোপন কোনো অগ্নিশিখার মতো, তাহ'লে,—তাহ'লে আর-কিছু তিনি চান না।

কল্যাণকুমার মনস্থির ক'রে ফেললেন সামনের টর্মেই যেতে হবে ; সেপটেম্বরে ভেসে পড়া। সময়ের দাম অনেক, সময় হারানো যায় না। দীর্ঘ কেব্‌ল্‌-বিনিময় চললো অক্সফোর্ডে কলকাতায়। এলো ভরতির খবর। তারপর কতগুলি উন্মাদ

দিন—পাসপোর্ট, সওদা, লোকজনের সঙ্গে দেখা করা, পরিচয়-পত্র, টাকা-পয়সার ব্যবস্থা—কল্যাণকুমারের যেন প্রায় মাথা-খারাপ হ'য়ে গেলো।

আর এরই মধ্যে একটু ফাঁক পেলে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রেম—বন্য, দুরন্ত, উদ্দাম প্রেম, উন্মত্ততায় আসুরিক। সময় নেই, একেবারেই সময় নেই; সময় হারানো যায় না। এক মাসের মধ্যে তাঁর তক্তা ভাসবে সমুদ্রে। নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে—আশায়, উদ্দীপনায়, উত্তেজনায় দিগন্তে মিশে-যাওয়া সমুদ্রের মতোই যে-জীবন ঝলমল করছে। তবু—তাঁর স্ত্রীর মধ্যেই তো একটা বিশ্ব: উদ্‌ঘাটন করতে হবে তারও রহস্য আর ঐশ্বর্য। যেমন এর আগে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিদ্যার্জনে, কর্মের প্ররোচনায়, বিবাহের সিদ্ধিতে—তেমনি এখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর স্ত্রীতে। আর অপর্ণা-দি লুটিয়ে পড়লেন চরম আত্ম-সমর্পণে: স্বামীকে পূর্ণ ক'রে তুলতেই হবে নিজেকে দিয়ে; নিজেকে তিনি দেবেন, নিজেকে নিংড়ে তাঁর আত্মার সূক্ষ্ম সৌরভ তিনি স্বামীকে দেবেন—যতক্ষণ না স্বামী সূর্যাস্তবিদ্ধ মেঘের মতো আগাগোড়া সোনা-রঙিন হ'য়ে ওঠেন তাঁর উষ্ণতা-সঞ্চারে, তাঁরই প্রতিফলিত আভায়।

আমার বিশ্বাস তাঁরা খুব গভীরভাবেই পরস্পরের প্রেমে পড়েছিলেন। দেখতে অদ্ভুত এই যুগল—দানবিক দুরন্ত পুরুষ, আর স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট একমুঠো মেয়ে। তাঁদের ছিলো প্রথম প্রেমের কোমলতা আর গাঢ়তা—আর সেই সঙ্গে সদ্য-

বিবাহিতের উন্মত্ততা। আর অত্যাসন্ন বিরহ তাকে আরো তীক্ষ্ণ, অসহ্যরকম সূক্ষ্মমুখ ক'রে তুলেছিলো নিশ্চয়ই। সেই মাসখানেক তাঁদের জীবন চলেছিলো একটা ঘূর্ণির কেন্দ্রে। এমন দিন গেছে, যখন তাঁরা বেলা দশটাতেও শয্যাত্যাগ করেননি। কেউ তাঁদের ডাকতে যায়নি; সবাই লক্ষ্য না-করবার ভাণ করেছে। কল্যাণকুমারের স্থান-কাল সম্বন্ধে সমস্ত বিবেচনা লোপ পেয়েছিলো: যে-কোনো সময়ে যে-কোনো ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়তে ভয় হ'তো, পাছে কোনো দাম্পত্য অন্তরঙ্গতার মধ্যে গিয়ে পড়ি। সে-ক'টা দিন আমাদের কাটাতে হয়েছিলো একটু সন্ত্রস্তভাবেই।

দিন এলো ঘনিয়ে। হঠাৎ কল্যাণকুমারের মনে পড়লো যে বোনের সম্বন্ধে কিছু-একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে হয়। মা-কে বললেন, 'একটা মুশকিলে পড়েছি, দিদি।'

'কী হয়েছে?'

মাথার সামনের দিকের বড়ো-বড়ো চুলগুলি নিয়ে নির্মমভাবে টানা-হেঁচড়া করতে-করতে কল্যাণকুমার বললেন, 'মায়ার কথা ভাবছি। ওকে কি হস্টেলেই রেখে যাবো—'

মা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'কেন, ও আমাদের এখানেই থাকবে।'

'সেটা কি ভালো দেখাবে?'

'উঃ, কী স্বার্থপর বাপু তোমরা। নিজে যখন বাড়িটাকে তোলপাড় ক'রে ছাড়তে তখন আর ভালো দেখাবার কোনো কথা উঠতো না।'

কল্যাণকুমার হেসে উঠলেন। তাঁর সেই অকপট উচ্চহাসি

আমি এখনো স্পষ্ট শুনতে পাই। তাতে ছিলো পুরুষের তেজ, পুরুষের ঋজুতা। 'কপাল, দিদি, কপাল। তখন যদি ভালো-মন্দ জ্ঞান না-ই হারাবো—ভাগ্য একবার সদয় হ'তে আরম্ভ করলে এমনিই হয়। মনে করো অপর্ণাকে যদি কখনো না দেখতুম। তাহ'লে কী উপায় হ'তো আমার, কী উপায় হ'তো!' কল্যাণকুমার এক গোছা চুল কপালের উপর টেনে এনে আঙুলে জড়াতে লাগলেন। 'আমি ফিরে এসে মায়াকেও বিলেতে পাঠাবো,' একটু পরে তিনি বললেন।

মা মধুরভাবে হাসলেন। তখন পর্যন্ত বাঙালি মেয়ের বিলেতে যাওয়া আরোব্যোপন্যাসের কাছাকাছি ছিলো।

'নীলকেও', কল্যাণকুমার বললেন, 'একবার ফিরে আসতে দাও—তারপর ছাখো না কী করি।'

'তুমি যে-জন্য যাচ্ছো, তাতে সফল হ'য়ে ফিরে আসো—তাহ'লেই হবে। আর-কিছু না-হ'লেও চলবে আমার।' মা স্যাঁৎসেঁতে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না: তবু মুহূর্তের জন্য হয়তো তাঁর মেয়ে-মন মোচড় দিয়ে উঠলো। কোথায় সেই দেশ, কোন সমুদ্রের পারে—সেখানকার মানুষ, সেখানকার কথা, ভাব-ভঙ্গি, চাল-চলন সবই অন্য রকম। ওর কিছু হবে না তো ওখানে গিয়ে? ঠিক এই মানুষই ফিরে আসবে তো? মা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। মনটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবার জন্য বললেন, 'মায়া আমাদের এখানেই থাকবে। বেশ হবে, অপর্ণার সঙ্গী হবে একজন।'

'সে-কথা ঠিক।' কল্যাণকুমার চিন্তাশীলভাবে শিষ দিলেন।

মায়া আমাদের সঙ্গে থাকবে শুনে আমার মন অদ্ভুতরকম চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। একটু আশাও, এমনকি। এর মধ্যে সে কয়েকবার এসেছিলো আমাদের বাড়িতে। অপর্ণা-দি আর সে যেন পরস্পরকে ভালোবাসবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো; তাদের বন্ধুতা মুহূর্তকাল সময় নেয়নি। আর তা ভাসা-ভাসা মেয়েলি বন্ধুতা নয়—দু'জনের স্বভাবে কোথায় যেন একটা গূঢ় ঐক্য ছিলো। গায়ে প'ড়ে একবার পান সেজে দিয়েই সে জয় করেছিলো মা-র হৃদয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের বাড়িতে সে অত্যন্ত সাদরে গৃহীত হয়েছিলো। আমার সঙ্গেও দু-একটা বাক্য-বিনিময় হয়েছিলো তার। বেশি কিছু যেন আমাদের বলবার ছিলো না পরস্পরকে। সে আমার বছর দুয়েকের ছোটো ব'লে আমি আমার সদ্য-বয়ঃপ্রাপ্তির গৌরবে তাকে ঠিক আলাপ করবার যোগ্য মনে করিনি। এদিকে এটাও মনে-মনে খোঁচা দিচ্ছিলো যে সে যেন আমাকে ঠিক আমলে আনছে না। তখনো আমার বোঝবার সময় হয়নি যে মায়ার বয়সের কোনো মেয়ের আমার বয়সের কোনো ছেলেকে প্রথম দর্শনে আমলে না-আনা মানেই—তার উল্টো। একটু দুঃখিত হয়েছিলুম, কিন্তু নিজের কাছে সেটা স্বীকার করিনি। দূর থেকে দেখতুম, অপর্ণা-দি আর মায়া কাছাকাছি ব'সে চুপে-চুপে কী-সব বলছে, হেসে উঠেছে—আমার মনে হ'তো সে-হাসিটা একেবারেই অকারণ। আমাকে দিয়ে আর প্রয়োজন

নেই; আমি ওখানে বেখাপ্পা। একবার কল্যাণকুমারের জন্য, আর-একবার তাঁর বোনের জন্য অর্পণা-দির সান্নিধ্য থেকে স'রে এলুম আমি। কিন্তু সেই সঙ্গে খুব বড়ো গোছের একটা আবিষ্কারও ক'রে ফেললুম; সেটা এই যে গোপনে কথা বলতে মেয়েরাই জানে।

২

এক বিষ্যুৎবার কল্যাণকুমারকে বম্বে মেইলে তুলে দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। মর্মস্পর্শী বিদায়-দৃশ্য। ইংরিজি কাপড়-চোপড়ে কল্যাণকুমারকে অত্যন্ত জমকালো দেখাচ্ছিলো। তাঁর দেহের ইংরেজ-সদৃশ উচ্চতা, হলদে-মিশোনো গৌরবর্ণ, তাঁর ঋজু, দৃঢ় চালচলন, কথা বলার সম্ভ্রান্ত ভঙ্গি—সব জড়িয়ে এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে আমাদের সুকোমল, সুকুমার, মসৃণ বাঙালি-জাতিরই তিনি অন্যতম প্রতিনিধি। এরই মধ্যে যেন তিনি আমাদের ছাড়িয়ে গেছেন, দূরে স'রে গেছেন আমাদের জগৎ থেকে। এরই মধ্যে তাঁর গায়ে লেগেছে দূর সমুদ্র-পারের সভ্যতার রং—যেন আর চেনাই যায় না। অবাক হ'য়ে আমি তাঁকে দেখতে লাগলুম। এতদিনে মাথার চুলের কথা মাথায় ঢুকেছে তাঁর—বায়রন-প্রশংসিত ম্যাকাসার অয়লের সাহয্যে তিনি তাঁর উতল কেশরাশিকে সযত্নে দ্বিখণ্ডিত ক'রে নিখুঁতভাবে পাট করেছেন—আর কথা বলতে-বলতে চুল নিয়ে টানা-হেঁচড়া করা থেকে বিরত হচ্ছেন সচেতন চেষ্টায়। সদ্য-কামানো তাঁর গাল প্ল্যাটফর্মের অস্বাভাবিক উগ্র আলোয় চিকচিকে, সোনার চশমার পিছন থেকে তাঁর চোখ হাসছে আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে। গাড়ি ছাড়বার সময় হ'লো; শেষ প্রাক্-বিদায় প্ল্যাটিটিউডগুলি মুখ থেকে-মুখে পুনরুচ্চারিত হ'তে লাগলো। মা-র চোখ ছলছলে;

মায়া রইলো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে; অপর্ণা-দি ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন জানলার সবচেয়ে কাছে—উজ্জ্বল সবুজ একটা রেশমি শাড়ি তাঁর পরনে—রংটা, বলতেই হবে, উপলক্ষ্যের সঙ্গে মানায়নি। শাড়িটা উৎসবের—এমনকি, একটু লঘুচিত্ত। বলা বাহুল্য, ও-শাড়ি প'রে অপর্ণা-দিকে অপরূপ দেখাচ্ছিলো। কল্যাণকুমারের সহযাত্রী এক আধাবয়েসি ইংরেজ স্টেশনের ঘড়ির দিকে তাকাবার অছিলায় মাঝে-মাঝে দেখে নিচ্ছিলো তাঁকে। খানিকক্ষণ তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন—কামরার জানলায় কল্যাণকুমার আর নিচে দাঁড়িয়ে, জানলায় হাত রেখে, অপর্ণা-দি। সবুজ নিশান উড়লো। হঠাৎ কল্যাণকুমার দু' হাত বাড়িয়ে অপর্ণা-দির মুখ কাছে টেনে নিলেন: তাঁকে দু' গালে ও ঠোঁটের উপর প্রবলভাবে চুম্বন করলেন তিন বার। ইংরেজটি তাকিয়ে একটু হাসলো; আমরা সবাই চোখ ফিরিয়ে নিলুম। গাড়ি ছেড়ে দিলো।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে মায়া বললো, 'তোমার চোখ দুটো একটু মুছে নাও, বৌদি।

অশ্রুর অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে অপর্ণা-দি হাসলেন। আশ্চর্য হাসি। বললেন, 'আমার চোখে জল এসে পড়েছিলো—সুখে, যেদিন ও ফিরে আসবে, সেই দিনের কথা ভেবে।'

বাবাকে নিয়ে আমরা পাঁচজন; গাড়িতে ধরতে চায় না। অন্যেরা উঠে বসবার পর আমি একবার তাকিয়ে বললুম, 'আমি বরং কোচবাক্সে—' ব'লে গাড়ির চাকায় পা রাখলুম উপরে

ওঠবার জন্য। পঞ্চম ব্যক্তি, মানে, তৃতীয় ব্যক্তি হ'য়ে অভ্যেস ছিলো আমার ; নিজেকে অতিরিক্ত, বাইরের লোক ব'লে ভাবতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত।

কিন্তু মায়া ব'লে উঠলো ভিতর থেকে : 'কেন, ও আসুক না, ভিতরেই আসুক। ঢের জায়গা এখানে,' ব'লে অপর্ণা-দির গা ঘেঁষে একটু স'রে বসলো।

আমি মা-র মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, 'আয় না।'

ঢের জায়গা সত্যি বলতে ছিলো না ; আমরা তিনজনেই ক্ষীণকায় ব'লে কোনোরকমে ঘেঁষাঘেষি ক'রে বসা গেলো। তা-ও যেটুকু জায়গা আমি ন্যায়ত নিতে পারতুম, তারও সবটা দখল না-ক'রে একেবারে ধার ঘেঁষে একটুখানি বসলাম আরকি। পিঠ টান করতে পারি না ; হাত দুটো নিয়ে মহা বিপদ। সামনের দিকে ঝুঁকে, হাঁটুর উপর কনুই দুটো চেপে আমার সেই বসাটা দেখতে সুশ্রী হয়নি নিশ্চয়ই। তা দেখতে যেমনই হোক—নিজেকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু পিঠের টনটনানি সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়লো দু'মিনিটেই। নাঃ, উপরে গাড়োয়ানের পাশে বসলেই ভালো করতুম।

হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যখন যাচ্ছি, 'কী অন্ধকার', মায়া ব'লে উঠলো, 'এই নীল—ত্যাখো না!' আমার কাঁধ ধ'রে মৃদু ঝাঁকুনি দিলো।

কর্তব্যপরায়ণভাবে, আমি চোখ তুললুম। কালো কালির স্রোতের মতো গঙ্গা। মাঝে-মাঝে নৌকোর ঘোলাটে আলো

টমিট করছে। একটু দূরে একটা জাহাজ নোঙর ক'রে আছে—বিদঘুটে মূর্তিটা।

'কী অদ্ভুত!' ব'লে উঠলো মায়া। এই টাটকা বিচ্ছেদে সে-ই যেন সবচেয়ে কম আহত: তার মন তার পারিপার্শ্বিককে গ্রহণ করছিলো নিজের মধ্যে—গঙ্গা, আর অন্ধকার, আর হাওড়া পুলের উপকার ছাল-ছাড়ানো, কাঁচা মানবতার ভিড়। সে মানুষ হয়েছে হস্টেলে—হালকা মেয়েলি আবহাওয়ায়: আশ্চর্য নয়, তার মন যে তীব্রবেগে ধাবিত হবে বৃহৎ স্পন্দমান জীবনের এই বিচিত্র, অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে।—'আচ্ছা, গাড়িটা এত আস্তে-আস্তে যাচ্ছে কেন?'

আমি বললুম, 'পুলের উপর ও-ই যায়।'

'কী লম্বা পুলটা! কখন ফুরোবে?'

'এই তো হ'য়ে এলো।'

'এরই মধ্যে! পুলটা যদি আরো অনেক লম্বা হ'তো, যদি পুলটাই চলতো অনেকক্ষণ ধ'রে, বেশ হ'তো তাহ'লে।

আমি শরীরের ভঙ্গিটাকে বদলাবার একটা কষ্টকর ও ব্যর্থ চেষ্টা করলুম।

গাড়ি হ্যারিসন রোড দিয়ে যেতে লাগলো। মায়া জিগেস করলো, 'হঠাৎ গরম লাগছে। কেন?'

ধ'রে নিতে হবে, আমিই এ-সব প্রশ্নের উদ্দেশ্য—কেননা আর-সবাই অন্যমনস্ক, নীরব। সংক্ষেপে বললুম, 'গঙ্গার উপরকার হাওয়া ঠাণ্ডা কিনা।'

'তাই!' মায়া মৃদুস্বরে হেসে উঠলো। 'আমি কী বোকা—এটাও বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, হাওড়ার পুলে রোজ বেড়াতে আসা যায় না? কী অদ্ভুত জায়গা।'

হাওড়া পুল যে ভদ্রলোকের বেড়াতে আসার জায়গা নয়, সে-কথা ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে বোঝাবার কোনো উৎসাহ পেলুম না। শুধু বললুম, 'হুঁ'।

'এই, শোনো না—' একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মায়া ঠেলা দিলো আমার হাতে; বেজে উঠলো চুড়িতে রুলিতে।

আমি মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'কী, বলো।'

'না, বলবো না। তখন শুনছিলে না কেন?'

স্ত্রী-স্বভাবের ছলনাপ্রিয়তায় অনভ্যস্ত, একটু অপ্রস্তুত, আমি আরম্ভ করলুম, 'বাঃ, আমি তো—'

'না, আগে বলো, তখন কেন শুনছিলে না। তখন কী ভাবছিলে, আগে বলো।'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি চুপ ক'রে রইলুম। স্রোতের মতো, আঁকাবাঁকা জলের মতো সূক্ষ্মগতি, কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মায়ার কণ্ঠস্বর, তার বলবার ভঙ্গি, তার দৃষ্টি, তার মুখ—সব জড়িয়ে যেন একটা অপরিচিত, অস্পষ্ট আবহাওয়া, যা আমার মনকে জড়িয়ে ধরলো দ্বীপান্তর থেকে ভেসে-আসা কোনো আকস্মিক সৌরভের মতো। আমার মনের এতদিন পর্যন্ত

লুকোনো অনেক কোণে-কোণে যেন সেই সব কথার প্রতিধ্বনি জেগে উঠছে।

'তুমি এত চুপ ক'রে থাকো কেন, বলো তো?' মায়া আবার বললো, 'কথা বলতে পারো না? কী ভাবো সব সময়?'

আমার কটিদেশ যেন আমার দেহের উর্ধ্বাংশ আর বহন করতে পারছিলো না: হঠাৎ ব'লে ফেললুম, 'দেখি, একটু সরো তো।'

'কোথায় আর সরবো?' মায়ার ছোটো-ছোটো, ঝকঝকে দাঁত মুহূর্তের হাসিতে ঝলসে উঠলো।

'উঃ'! পিঠটা টান করতে গিয়ে কনুই ঠুকে গেলো গাড়ির জানলায়।

'এত উঃ-আঃ করছো কেন? হয়েছে কী?'

একবারের মতো আমার অসংশোধনীয় ভালোমানুষি পরিত্যাগ ক'রে পিঠটাকে হেলান দিয়ে ভদ্রলোকের মতো বসলুম। মায়ার শরীরের উষ্ণ কোমলতা আমার শরীরের এক পাশে প্রতি মুহূর্তে চাপ দিতে লাগলো। অবিশ্রান্ত কথা বলতে লাগলো সে—আমি বেশির ভাগ চুপ। বাকি রাস্তা আমি তাকে অনুভব করলুম—শাড়িতে জড়ানো সেই উষ্ণতার ভার। আমার জীবনের সেটা একটা অভিজ্ঞতা, একটা উন্মোচন। আমি কখনো জানতুম না যে কোনো মেয়ের শরীরে এত অর্থ থাকতে পারে। আমার মনে হ'তে লাগলো যেন আস্তে-আস্তে কোনো মধুর, সূক্ষ্ম সুরা আমার সমস্ত

স্নায়ুতে তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হ'য়ে পড়ছে; কিন্তু মায়া—তার কথার বিরাম নেই; সে সম্পূর্ণ নিশ্চেতন।

বাড়ি ফিরে দুঃসহ শূন্যতা। কল্যাণকুমারের অভাবে আমাদের বাড়ির দেয়ালগুলি পর্যন্ত ফাঁকা হ'য়ে গেছে। এমন দুরন্ত, উচ্ছলিত প্রাণ আর কার—আর কে অমন সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে, সব জায়গা একসঙ্গে ভ'রে রাখবে? প্রথম কয়েকটা দিন মা একটু মুষড়ে রইলেন; কবে কল্যাণকুমারের চিঠি আসবে তার অতি সহজ, প্রাথমিক গণিতে সম্পাদ হিশেব—তা-ই নিয়ে চললো দীর্ঘ, সাগ্রহ জল্পনা। মা অ্যাটলাস খুলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ম্যাপ দেখতেন—এই রাস্তা দিয়ে ও যাচ্ছে, এই-এই জায়গায় ওর জাহাজ দাঁড়াবে—ঐ তো ছোট্ট লাল ইংলণ্ড, তার মধ্যে অক্সফোর্ড কোথায়? অক্সফোর্ড কেমন জায়গা? শীত কি সেখানে খুব? এতদিনে জাহাজ কতদূর গেছে?—এডেন তো খুব কাছেই মনে হয়। আমাকেই এই সব তথ্যের জোগান দিতে হ'তো সাধ্যমতো। আমি বলতে পারি, মা তাঁর সমস্ত জীবনে যতটা ভূগোল না-শিখেছিলেন, সেই ক'দিনে জেনেছিলেন তার অনেক বেশি।

চিঠি এলো এডেন থেকে। অপর্ণা-দি আর মা-র কাছে পুরু খামের চিঠি—মায়া আর আমার কাছে ছবিওলা পোস্টকার্ড। জাহাজের বর্ণনা, ভোজনের বর্ণনা, সমুদ্রের পীড়া—যেমন এডেন থেকে লেখা বিলেতযাত্রী বাঙালি যুবকের চিঠি সাধারণত হ'য়ে থাকে। বলবার মতো বিশেষ-কিছু নয়। তবু তুমুল আন্দোলন

তা-ই নিয়েই। অদল-বদল ক'রে প্রত্যেকটি চিঠি বহুবার পড়া হ'লো। দাম্পত্য লিপি ব'লে অপর্ণা-দির চিঠিকেও রেয়াৎ করা হ'লো না: সে-চিঠিও আমরা দেখতে পেলুম—বরং, আমাদের দেখতেই হ'লো—অবশ্য চিঠিতে এমন-কিছু ছিলো না যাতে তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে তা পড়া অশোভন হ'তে পারে। চিঠিটা আশ্চর্যরকম সমতল, কোণখোঁচহীন, নীরস, নীরক্ত। যে-লোক জীবনে অমন প্রচণ্ড আবেগময়, চিঠিতে সে স্বাদহীন, উত্তাপহীন, এমনকি, একটু ক্যাঁকালো। মা-র কাছে লেখা চিঠি থেকে আলাদা এক প্রস্থ বর্ণনা; অপর্ণা-দির অভাব কী-রকম তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, তার উল্লেখ; অপর্ণা-দির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎসুকতা; তারপর কয়েকটি গম্ভীর উপদেশ-বাণী: 'সব সময় ভবিষ্যতের কথা মনে রাখবে, মহৎ জীবনের দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে আমার সঙ্গে, নিজেকে প্রস্তুত করবে সে-জন্য। নিজেকে প্রস্তুত করবে—শিক্ষায়, চিন্তার প্রসারে, মনের সমৃদ্ধিতে। নিছক স্ত্রী হ'য়ে থাকতে তুমি যেন না চাও, তুমি যেন হ'তে পারো সত্যিকার সহধর্মিণী।' ইত্যাদি ইত্যাদি লম্বা এক প্যারাগ্রাফ। প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই থাকতো ঐ-রকম। জানি না, অপর্ণা-দির কেমন লাগতো ও-সব। তবে এই রকম কয়েকটা চিঠি প'ড়ে একটা জিনিশ আমি আবিষ্কার করি: তা এই যে চিঠি লেখা বিশেষ-একটা ক্ষমতা, যে পারে, শুধু সে-ই পারে। ভালোবাসলেই ভালো চিঠি লেখা যায় না, যেমন প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারলেই লেখা যায় না ভালো কবিতা।

পোর্ট সৈয়দ থেকে, মার্সাই থেকে চিঠি এলো, লণ্ডন থেকে কেব্‌ল্‌, অক্সফোর্ড থেকে চিঠি। সেণ্ট জন্স হল্‌-এর ছাপ-মারা সেই চিঠির কাগজের দিকে আমরা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। সেই কাগজের উপর কল্যাণকুমারের হাতের লেখার একটু আত্ম-সচেতন ভাব—যেন তিনি জানেন যে আমরা মুগ্ধ হবো, যেন তিনি তা-ই চান। প্রথম কয়েকটি চিঠিতে অক্সফোর্ডের ইতিহাস, তাঁর হলের ইতিবৃত্ত, কোন-কোন জগদ্বিখ্যাত ইংরেজের স্মৃতিতে অক্সফোর্ড গৌরবময়, তার দীর্ঘ ফিরিস্তি। সে-সব চিঠি একটু গাইড-বুক গোছের হ'য়ে উঠতো যেন: কল্যাণকুমারের লেখার কোনো স্টাইল ছিলো না। এলো তাঁর গাউন আর হুড পরা ফোটোগ্রাফ—চেনাই যায় না। এমন চমৎকার তাঁকে কখনো দেখায়নি। ছবির দিকে তাকিয়ে পলক পড়লো না অপর্ণা-দির চোখে। বুঝতে পারলুম তাঁর মনের ভাব। 'আ—এই দৃপ্ত বলশালী বিদ্যুৎময় পুরুষ—সে ফিরে আসবে আমার কাছে—আমারই কাছে সে ফিরে আসবে বিশাল পৃথিবীর সীমাপ্রান্ত থেকে—আমার কাছে, এই যেখানে আমি নিজেকে নিজের মধ্যে সঞ্চিত ক'রে রাখছি, যাতে সে আমাকে নিঃশেষে পান করতে পারে, যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয়—কিন্তু তারই চুম্বনে আবার আমি পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে উঠবো।

এই রকমের চিন্তা অপর্ণা-দির মনে—যতদূর বুঝতে পারি। আর এদিকে ক্ষীণ হ'য়ে আসতে লাগলো পত্রস্রোত। পড়াশুনোর চাপ—সময় কম। এখানে যেমন, সেখানে গিয়েও কল্যাণকুমার

সীরিঅস ছাত্র—তার বেশি আর কিছু না। ভাবে ভঙ্গিতে কোনো চপলতা প্রকাশ পেলো না কোনো চিঠিতে। বাঙালি যুবকের পক্ষে ইওরোপীয় জীবনের যে-অসংখ্য সব প্রলোভন, কল্যাণকুমারকে তার কিছুই যেন আকর্ষণ করেনি মুহূর্তের জন্যও। নিশ্চিন্ত হবার কথা—হ্যাঁ, আমার মা নিশ্চিন্ত হলেন। আর অপর্ণা-দিকে আরো ঘন ক'রে আচ্ছন্ন করলো পূজার সুরভিত ধূম।

শুধু আমি রইলাম বিচ্ছিন্ন, অনুতপ্ত। অর্ধ-চেতনভাবে আমি অনুভব করলুম যে মাঝে-মাঝে একটু চপলতা থাকলে একটু-যেন স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলা যেতো। গাম্ভীর্যের বড়ো রেশি ঠাশবুনোনি। হাঁপিয়ে উঠতে হয়। মাঝে-মাঝে আমার কাছে আসতো চিঠি: 'ভালো ক'রে পাশ কোরো—কিন্তু শুধু পাশ করাতেই আবদ্ধ থেকো না: অজস্র পড়াশুনো করো, ভাবতে শেখো, শরীরকে অবহেলা কোরো না। তোমাকেও আসতে হবে অক্সফোর্ডে—তোমাকে দিয়ে আমাদের অনেক আশা। জীবনে উচ্চাশা রেখো, প্রকৃত উচ্চাশা। অনেক আশা রাখি তোমাকে দিয়ে—সে-সব সার্থক করাই চাই। কিছু বই পাঠালুম—কেমন লাগে লিখো, যা-কিছু তুমি পড়ো আর ভাবো, তাতে সঙ্গী ক'রে নিয়ো অপর্ণাকে। আমার সব সময় মনে হয়েছে অপর্ণার উপর তোমার প্রভাব কত বেশি তা ও নিজেই জানে না। তোমার বয়স অল্প, কিন্তু তোমার মন অসাধারণ। যে-জীবন আমি মনে-মনে কল্পনা

করছি, তার সম্পূর্ণতার জন্য তোমাকেও চাই আমার।' ইত্যাদি। সময়-সময় চিঠিগুলো বড়োই দীর্ঘ হ'য়ে পড়তো; কথাগুলি হ'য়ে উঠতো অসংলগ্ন—একটু উদ্ভ্রান্ত, এমনকি। দূরে থেকেও আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর কত খুঁটিনাটি ভাবনা—অবাক লাগতো আমার। 'তোমার জন্য প্রায়ই ভাবনা হয়', একবার তিনি আমাকে লিখেছিলেন, 'তোমার এখন যে-বয়সে সেটা বড়ো বিপদের, বড়ো ভয়ংকর। আমি জানি, জানি ব'লেই বলছি। আমি নিজেও ভয় পেয়েছিলুম। তোমাকে বলি, ভয় কোরো না। সাহস ক'রে কাটিয়ে ওঠো। এক-এক সময় মনে হবে, নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারছো না, কিন্তু ভয় কোরো না। ও-সব কেটে যাবে।' আমি ঠিক তাঁরই ভাষা উদ্ধৃত করছি না; কিন্তু এই চিঠিটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকাশভঙ্গির এতখানি সৌষ্ঠব তাঁর অন্য-কোনো চিঠিতে ছিলো ব'লে মনে করতে পারি না। সবই চাপা ছিলো; অথচ সবই বলা হয়েছিলো। সুখের কথা, ও-সব উৎসাহ-বাণী জীবনের যে-অবস্থায় দরকার, তা আমি পার হ'য়ে এসেছিলাম। ও-চিঠি প'ড়ে, তাই, মনে-মনে হাসতে পেরেছিলুম। শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো কৈশোরের যন্ত্রণার, অবমাননার দিন: যৌবন তার সমস্ত স্বপ্নের সোনা ছিটিয়ে দিতে আরম্ভ করেছিলো একজনের চরণ-প্রান্তে। আমি জেগে উঠেছিলুম: যৌবনের প্রথম আঘাতের ভগ্নাংশরাশি থেকে নিজেকে কুড়িয়ে নিতে পেরেছিলুম সম্পূর্ণ ক'রে, নতুন ক'রে।

অপর্ণা-দির কাছেও ও-জাতীয় ভারি ওজনের চিঠি আসতো নিশ্চয়ই। আর স্বামীর ধারণা অনুসারে তিনি হ'য়ে উঠতে চাইতেন : স্বামীকে যেন কখনো কোনো বিষয়ে হতাশ করতে না হয়, এই ছিলো তাঁর প্রার্থনার ভাষা। বার-বার ক'রে তিনি পড়তেন চিঠিগুলি। এমন চিঠি নয়, যা থেকে আস্তে-আস্তে, অনেকক্ষণ ধ'রে নিবিড়, নিহিত কোনো রস নিষ্কাষণ করা যায়। কিন্তু যে-কোনো জিনিশের মধ্যে যা আমরা পড়তে চাই, তা-ই পড়তে পারি। আমি ঠিক জানি, অপর্ণা-দি ও-চিঠিগুলিকে ভালোবাসতেন। সব শেষ হ'য়ে যাবার পর সেগুলি পাওয়া গিয়েছিলো তাঁর তোরঙ্গের তলায় স্তূপীকৃত শাড়ির নিচে—তাঁর স্বামীর প্রত্যেকটি চিঠি—রেশমি ফিতে দিয়ে সময়-অনুসারে ভাগ-ভাগ ক'রে বাঁধা। চিঠিগুলি মা উদ্ধার ক'রে এনেছিলেন—রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে। তারপর একদিন হঠাৎ সেগুলি অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিলো—যেমন, যত জিনিশ আমরা আমাদের দুর্বলতায়, হতাশায় আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাই—সব একদিন হঠাৎ অদৃশ্য হ'য়ে যায়। ভালোই; এ-ব্যবস্থাই ভালো। অপর্ণা-দির একটি চিঠি আমার কাছে নেই—না একটি ছবি, না একগোছা চুল। কিছু নেই। আর আর-একজন—এখনো সে পৃথিবীতে বেঁচে আছে—ঐতিহাসিক অর্থে, সময়ের মধ্যে বেঁচে আছে; কিন্তু আমার কাছে সে মৃত, বহুদিন মৃত। এখন ভাবলে মনে হয় তাকে যেন জেনেছিলাম অন্য-কোনো জগতে, অন্য-কোনো জীবনে।

মনে হয় যেন অতীতের কোনো কাহিনী, বহু শতাব্দীর কুয়াশার ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট। স্মৃতিচিহ্নের উপর আমার মনের কোনো মোহ নেই। ওটা আমার মনে হয় নিজেরই আত্ম-প্রেমের চরিতার্থতা—তা ছাড়া কিছু নয়। যেটা যখন শেষ হয়, সেটা চরম নিঃশেষ হ'য়ে গেলেই আমি খুশি। তারপর—যদি ভুলেই যাই, তাহ'লে স্মৃতিচিহ্নের জাদুঘরে বাস করলেও মনে পড়বে না; আর একবার যদি মনে ফিরে আসতে আরম্ভ করে, তখন তো ও-সব জিনিশ দুঃখকর বাহুল্য হ'য়ে দাঁড়ায়। আর ও-সব চিহ্ন দিয়ে যন্ত্রণা কেন বাড়ানো, যখন স্মৃতির তীব্রতাই এক-এক সময় অসহ্য?

৩

কল্যাণকুমার চ'লে যাবার কয়েকদিন পর্যন্ত আমাদের সংসারে কেমন-একটু বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। মা-র মন ভালো নেই, আর অপর্ণা-দি যেন সব সময়েই অনুপস্থিত। আমাদের এতদিনের সুসমঞ্জস, তাড়াহুড়োহীন নিখুঁত মাত্রা-মেনে-চলা জীবনযাত্রার হঠাৎ যেন ছন্দ কেটে যাবার উপক্রম হ'লো।

বিপদ কাটিয়ে দিলো মায়া। তার স্কুলের তখন পুজোর ছুটি—সারাদিন ভ'রে সে অতি সহজে, অনায়াসে, যেন কাউকে বুঝতে না-দিয়ে কত সব ছোটোখাটো টুকিটাকি ক'রে যাচ্ছে—ও-সব মেয়েলি কাজের বিবরণও আমি দিতে পারবো না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কত-যে অসংখ্য তুচ্ছ প্রয়োজন, আমরা পুরুষরা সাধারণত তা ভুলে' থাকি—(ভুলে' থাকতে পারি, সে-জন্য স্ত্রীজাতিকে ধন্যবাদ।) বাড়ির মধ্যে মায়াকেই দেখলুম অখণ্ড, তার জাগ্রত চৈতন্যে সম্পূর্ণ। তার দাদার মতো সে-ও ছিলো চঞ্চল, উচ্ছল, উচ্ছ্বাসী। এটা করতে আর ওটা করতে তার কখনো ক্লান্তি ছিলো না, কথা বলা চাই সকলের সঙ্গে, তার হাসি বায়ুমণ্ডলকে টুকরো ক'রে কেটে দিতো গ্রীষ্মের হঠাৎ-হাওয়ার মতো। তবে অবশ্য কল্যাণকুমারের মতো তার প্রাণশক্তি উদ্দাম জল্পনায় আর শারীরিক ছটফটানিতে ফুটে বেরতো না—সে-বিষয়ে, বরং, সে ছিলো উল্টো। মেজাজ তার ঠাণ্ডা, কথা

ভাঁর নরম ; কখনো তাড়া করে না, সব সময়ই যেন অনেক সময় আছে হাতে। অথচ যখন যেটা হবার, ঠিক হ'য়ে যাচ্ছে। 'বেশ গুছোনো মেয়ে', মা-কে বলতে শুনলাম।

রাত ক'রে শোয়া আর দেরি ক'রে ওঠার অভ্যেস করছি তখন থেকেই। একটু বড়ো হ'তে-হতেই আমি ভালোবেসেছি পরিণত রাত্রির স্তব্ধ গাঢ়তা—প্রার্থনা করেছি মধ্যরাত্রির সূক্ষ্ম-নিষ্যন্ত সান্ত্বনার রস, দিনের জীবনের লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষয়ের যাতে পরিপূরণ। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বই পড়া ছিলো আমার জীবনের উচ্চতম সুখ। সারা দিন ভ'রে অসংখ্য ভাঙাচোরা—কলেজ, লোকজনের সংশ্রব, মর অস্তিত্বের নানা তুচ্ছ প্রয়োজনের দাবি—আর রাত্রির নিঃসঙ্গতায় নিটোল পরিপূর্ণতা। এখনো মনে ক'রে আনন্দ পাই—টুর্গেনিভের সঙ্গে যে-দীর্ঘ, সুখ-নিবিড় ঘণ্টাগুলি কাটাতুম। সে-সময়ে টুর্গেনিভ ছিলেন আমার প্রিয় লেখক। সেই প্রতিভাবান রুশের মধুর কোমলতা স্বর্গের শিশিরের মতো ঝ'রে পড়তো আমার মনের উপর, আশ্চর্য বিষাদে টনটন ক'রে উঠতো মন। বই শেষ ক'রে আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘুম আসতো না অনেকক্ষণ। সেই নরম অন্ধকারে যেন ভেসে বেড়াতো টুর্গেনিভের অপরূপ রুপোলি মেয়েদের শুভ্র ছায়া। পরবর্তী জীবনে আমি অনেক পড়েছি; অনেক লেখককে ভালোবেসেছি, পূজা করেছি; কিন্তু এখন মনে হয় অমন একান্ত ক'রে আর কখনো কোনো বই উপভোগ করিনি। বুদ্ধি যখন প্রধান হ'য়ে ওঠে, তখন ও-রকম উপভোগ আর সম্ভবই হয় না বোধহয়।

আর তার পরে, সমস্ত জীবন, আমার আর টুর্গেনিভের বই ছুঁতে সাহস হয়নি, পাছে ও-রকম ভালো আর না লাগে, পাছে আবিষ্কার করতে হয় যে সে-জাদু হারিয়ে গেছে। ষোলো থেকে আঠারো বছরের মধ্যে যে-মানুষ টুর্গেনিভ পড়লো না, তার প্রতি একটু করুণা অনুভব না-ক'রে পারি না। টুর্গেনিভ নবযৌবনের কবি।

এক সকালবেলায় ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলুম, কেউ আমাকে ডাকছে। স্বপ্নের সঙ্গে সেটা মিশে গেলো, ঘুম ভাঙলো না। স্বপ্নের মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হ'তে লাগলো। তারপর আমার চুলে পড়লো মৃদু টান। বিরক্ত হ'য়ে চোখ মেলে দেখলুম, মায়া দাঁড়িয়ে আছে শিয়রে। মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেলো।

মায়া বললো, 'চা।'

তাকিয়ে দেখলুম, আমার শিয়রে ছোটো টেবিলের উপর বইয়ের ছোটো স্তূপের পাশে চায়ের পেয়ালা। মায়া আমার মাথায় আর-একটা ঠেলা দিয়ে বললে, 'এই, ওঠো।'

অপ্রতিভ, লজ্জিত, আমি বালিশটা উলটিয়ে নিয়ে তার মধ্যে মুখ লুকোলাম। উঠতে ইচ্ছে করছিলো না, সত্যি। সকাল-বেলাকার মধুর আলস্য এত শিগগির ছাড়তে কে চায়?

মায়া বললো, 'হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটা নাও না; ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।'

বিছানায় শুয়ে চা-পানের বিলাসিতায় অনভ্যস্ত, বালিশের ভিতর থেকে আমি বললুম, 'এই উঠছি।'

'উঠতে তোমাকে কে বলছে? চা খেয়ে আবার ঘুমোও না।'

আমি বললুম, 'এখানে কেন নিয়ে এলে? নিচেই তো যেতুম একটু পরে।'

'সেইজন্যই তো। রোজ তোমার চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।'

'তাই ব'লে এখানে—' আমার জন্য কেউ কষ্ট ক'রে নিচে থেকে চা নিয়ে আসবে, এটা ভাবতে আমার খারাপ লাগছিলো। আমার জন্য কাউকে কিছু করতে দেখলেই কেমন কুঁকড়ে যেতো আমার মন। সেবাগ্রহণে অনভ্যস্ত, সব সময় আমার ভয় থাকতো, পাছে কারো প্রতি অন্যায় ক'রে ফেলি, কোনো অসংগত সুবিধে নিই কারো উপর। গৃহ-ভৃত্যের পরিচর্যাও আমি কোনোদিন সহজভাবে নিতে পারিনি।

'কেন, হয়েছে কী?'

আমি বললুম, 'মুখ ধুতে সেই নিচে তো যেতেই হবে। একই কথা।'

'না-ই বা ধুলে মুখ। মুখ না-ধুয়েই তো চা খেতে হয় সকালবেলায়। নিয়ম আছে।' মায়া হেসে উঠলো। 'কিন্তু কথাই যদি বলবে, তাহ'লে আর—'

'না, এই তো—' বুকের নিচে একটা বালিশ দিয়ে আমি হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা টেনে নিলুম বিছানার উপর। একটা প্রাথমিক চুমুক দিয়ে মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'ক'টা বেজেছে বলতে পারো?'

'বেজেছে? ওঃ, অনেক। সাতটা বেজে গেছে কখন।'

'মোটে সাতটা!'

'মোটে! কখন ভোর হয়েছে জানো? জীবনে কখনো ভোর দেখেছো?'

আমি বললুম, 'এই সকালবেলার দিকটা ঘুমিয়েই কাটাতে হয়। নিয়ম আছে—জানো না?'

দু' জনে একসঙ্গে হেসে উঠলুম।

চায়ের উষ্ণতা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিলো; ঘুমের জড়তা যাচ্ছিলো কেটে। রাত্রির ঘুমে-মাখানো বালিশ বুকের নিচে চেপে ধ'রে একটু-একটু ক'রে চা খেতে-খেতে নিজেকে একটি ক্ষুদ্র রাজার মতো বোধ হ'তে লাগলো।

একটু পরে আমি বললুম, 'তুমি? তোমার চা?'

'আমার হ'য়ে গেছে।'

'যাক, আমি ভাবেছিলুম তোমার চা বুঝি এদিকে নিচে জুড়িয়ে গেলো।'

'পাগল—আমি কি অতই বোকা!'

'আমি যদি তুমি হতুম, তাহ'লে কিন্তু অন্যরকম করতুম।'

মায়া ভুরু বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো।

'তাহ'লে আমি দু' হাতে দুটো পেয়ালা নিয়ে উপরে আসতুম এ-ঘরে।'

'কী হ'তো তাতে?'

'বইয়ে লেখা আছে যে চা জিনিশটা দু'জনে ব'সে খেলেই বেশি ভালো লাগে।'

মায়া মুচকি হেসে বললো, 'বইয়ে আর কী-কী লেখা আছে বলো তো।'

তার পরের দিন সকালে সে নিয়ে এলো দু' পেয়ালা চা। বসলো আমার বিছানার এক পাশে। কোনো মানুষের এক পেয়ালা চা খেতে অত সময় লাগা উচিত নয়; কখন আটটা বেজে গেলো, বুঝতেই পারলুম না। কথা বলতে আমি কখনোই খুব নিপুণ নই: কিন্তু তখন, সদ্য-ঘুম-ভাঙা সেই সকালবেলায়, উষ্ণ আলস্য পোহাতে-পোহাতে, স্বপ্ন-জড়িত অবকাশের সৌগন্ধ্যে— সবই যেন তখন অন্য রকম। পৃথিবীতে এত কথা বলবার আছে কে জানতো? অতি তুচ্ছ কথায়, ক্ষীণতম ভঙ্গিতে, একটু হাত তোলায়, চোখের পলকের ঈষৎ শিহরণে—যে-কোনো জিনিশে, সব জিনিশে এত অর্থ আছে কে জানতো? ভালো ক'রে দিন আরম্ভ হবার আগে এই একটুখানি সময়—মনে হ'তো, তা যেন রাত্রির স্বপ্নেরই ধারাবাহিকতা। শুধু, এই জেগে-ওঠা স্বপ্ন দেখছি আর-একজনের সঙ্গে। সকালবেলাটা হঠাৎ অর্থময় হ'য়ে উঠলো আমার কাছে। ঘুম ভেঙে গেলেও আমি চোখ বুজে শুয়ে থাকতুম মায়ার ডাক শোনবার জন্য, আমার চুলের মধ্যে তার আঙুলগুলি অনুভব করবার জন্য। রাত্রিতে ঘুমোবার আগে মনে হ'তো, কাল চোখ মেলেই তো মায়াকে দেখবো। তখনো বুঝতে পারিনি, কোনদিকে ভেসে চলেছি।

কবিতার পথে সেই আমার প্রথম পদচারণা। আমার টেবিলের দেরাজে ইতিমধ্যেই কোনো-না-কোনো পৌরাণিক বিষয়

অবলম্বন ক'রে আস্ত দুটো গীতিনাট্য জ'মে উঠেছে। পদ্যের দুটো-একটা টুকরো তৈরি হ'তো প্রায়ই রোজই। আমাকে তখন ঘিরে ছিলো কৌমার্যের লজ্জা: ও-সব লেখায় কেউ উঁকি দেবে, এ-চিন্তা আমার পক্ষে মৃত্যুর মতো। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে অনেক সময় পেন্সিল দিয়ে লিখতুম; কাগজগুলি চাপা থাকতো বালিশের নিচে। তাইতেই ধরা প'ড়ে গেলুম একদিন। ঘুমের অভিনয় একটু বেশিক্ষণ ক'রে ফেলেছিলুম (অত্যন্ত স্বচ্ছ অভিনয়, বলা বাহুল্য), মায়া উত্যক্ত হ'য়ে এক টানে আমার মাথার তলা থেকে সরিয়ে দিলো বালিশ। সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলো, 'বাঃ, এগুলি কী?'

আশ্চর্য কোনো আবিষ্কার নয়, মাত্রই কয়েকখানা কাগজ। কিন্তু আমি উঠে বসলুম ধড়মড় ক'রে। মায়া, দেখলুম, নির্বিকার মুখে কাগজগুলি উল্টে-পাল্টে দেখছে। লজ্জায়, দুঃখে, রাগে আমি ম্লান হ'য়ে গেলুম। কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বললুম, 'দাও।

'কী এগুলো?'

'ও কিছু না। দাও।'

'দেখি না?'

'না, দাও শিগগির।'

মায়া তক্ষুনি আমার হাতে কাগজগুলি ফিরিয়ে দিলো। এতটা বাধ্যতা, সত্যি বলতে, আশা করিনি। এ-রকম তো কোনোখানে লেখে না। টানা-হেঁচড়া হয়, কাগজটা মুচড়ে যায়,

এমনকি ছিঁড়ে যায়; আর শেষ পর্যন্ত অবশ্য, গোপন কথাটা প্রকাশ পেতে বাকি থাকে না। এত তেজ দেখালাম কেনই বা। নিজেকে কেমন-একটু বোকা-বোকা মনে হ'তে লাগলো।

চা খেতে-খেতে মায়া বললো, 'ভারি তো! দেখালে না তো হয়েছে কী? ও কি আমি আবার বের করতে পারবো না ভেবেছো?'

মনে-মনে এবার আমার আশা হ'লো, কিন্তু মুখ খুব গম্ভীর ক'রে বললুম, 'ও তুমি দেখে কী করবে।'

'বাঃ, তুমি লিখেছো আর আমি দেখবো না?'

'আমি লিখেছি! কে বললো তোমাকে?'

'দেখলুম যে।

'না তো।'

'আহা, না-হয় লিখেইছো, তাতে এমন-কী হয়েছে?'

এ-কথা শুনে আমি আরো গম্ভীর হলুম, কিন্তু এ-গম্ভীরতা অন্য রকম। সত্যি তো, আমার লেখা কি এমন-কিছু যা নিয়ে এতটা হৈ-চৈ মানায়? কই, মায়া তো দেখবার জন্য খুনোখুনি করলো না। আমি তা-ই ভেবেছিলুম। সে-জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলুম, বলতে গেলে। মায়া না-দেখে ছাড়বেই না, আর আমিও দেখাবো না—কিছুতেই, কিছুতেই না। কিন্তু সে-রকম কিছু হ'লো না। বড়ো সহজেই হার মানতে হ'লো আমাকে।

চা শেষ ক'রে মায়া হাত বাড়িয়ে দিলো।—'দাও দেখি।'

তারপর, আমাকে ইতস্তত করতে দেখে: 'আহা—দাও না! জেনে তো ফেলেইছি, এখন আর লুকিয়ে কী হবে?' ৮

এখন না-দিলে বড়ো যেন দেখানোপনা হ'য়ে যায়, স্রেফ বাহবা নেবার ভাব। কাঁচুমাচু মুখে বের ক'রে দিতে হ'লো আমার গত রাত্রের লেখা কাগজ।

একবার যখন লজ্জা ভাঙলো, তখন আর কী। অন্য কাউকে নিজের লেখা পড়াবার আনন্দ আমি জানলুম। পেলুম প্রশংসার মদিরার স্বাদ। পরম বিশ্বাসে আমি নির্ভর করলুম মায়ার উপর। এমনকি, আমার সমস্ত গোপনতা-সংবলিত দেরাজের চাবি ন্যস্ত হ'লো তার হাতে। তার কাছে কিছুই ঢাকা রইলো না, রাখতে ইচ্ছেই করলো না। একটা কবিতা লিখতে যেন খানিকটা অতিরিক্ত আনন্দ পেতুম—সে পড়বে ব'লে। সে যতক্ষণ না পড়তো, আমার লেখাই যেন অসম্পূর্ণ। ক্রমে তার সাহায্যে আমার কবি-খ্যাতি আস্তে-আস্তে অপর্ণা-দির কানে, মা-বাবার কানেও পৌঁছলো। সে-খ্যাতিতে আমার হৃদয় বসন্ত-ব্যাকুল পাখির মতো নেচে উঠেছিলো। পরে যখন সে-খ্যাতি দেশ ভ'রে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তখন অবশ্য খ্যাতি থেকে কোনো আনন্দ পাবার ক্ষমতাই লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিলো আমার। ততদিনে আমি লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, কী-রকম সব লোক খ্যাতিলাভ করে জীবনে।

আমার লেখা প'ড়ে কেউ খুশি হয়, এটা আমার পক্ষে একটা নতুন, একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। মায়া ক্ষুধিত আগ্রহে আমার

কবিতাগুলি পড়তো—সে যে খুশি হ'তো তাতে সন্দেহ নেই। আর তার খুশি দেখে খুশি হ'তো আমার মন। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে কোনো-একটা জায়গায় আমার বিশেষ স্থান আছে, কোনো-একজন মানুষকে খুশি করবার ক্ষমতা আমার আছে, এতে ভারি আশ্চর্য লাগলো আমার। নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণাই বদ্‌লে যেতে লাগলো। সে-সময়ে মায়াকে খুশি করবার জন্য যে-সব লঘুরসের, নিতান্তই মুখোমুখি কবিতা আমি লিখছিলুম, পরবর্তী কালে দু' চারজন এম.এ., পি.এইচ.-ডি. তাদের ব্যাখ্যা ক'রে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন মাসিকপত্রে।

সন্ধেবেলাটা আমি কাটাতুম বাড়ির ছাদে—যদি বাধ্য হ'য়ে অন্য কোথাও যেতে কি অন্য-কিছু করতে না-হ'তো। ছাদের ঢেউ-তোলা শহর-সমুদ্রের উপর ধূসর সন্ধ্যাকে নামতে আমি কত দিন দেখেছি—কখনো আমার চোখে তা পুরোনো হয়নি। আমি ভালোবাসতুম চেয়ে থাকতে—লঘু-নীল আকাশ ফেটে যখন প্রথম সবুজ তারা বেরোতো, আমাদের গলিতে মই নিয়ে-নিয়ে কর্তব্যপরায়ণ উড়ে একটার পর একটা গ্যাস জ্বালিয়ে দিয়ে যেতো (একদিনও কি ওর ভুল হ'তে নেই, আমি ভাবতুম, একদিনও কি ওর কাজে ফাঁকি দিতে ইচ্ছে করে না?), রাত্রি যখন আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়তো একটা শারীরিক অনুভূতির মতো। রাত্রির আর তারার আর আকাশের স্তব্ধতার মুখোমুখি—আমি, ছোটো ছেলে, আমি চিরন্তন মানবাত্মা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকেছি, চেয়ে দেখেছি, প্রশ্ন করেছি। ছাদে ওঠবার

সিঁড়িটা ছিলো কাঠের, খুব নিরাপদ নয়, সাধারণত আর-কেউ সেখানে আসতো না। সমস্ত বাড়ির মধ্যে ছাদটা আমারই একলার সম্পত্তি ব'লে জেনে এসেছিলুম। কিন্তু মায়ার তাতেও ভাগ বসানো চাই। হঠাৎ এক-একদিন এসে উপস্থিত হ'তো—চুল বিস্রস্ত, বুক দ্রুত ওঠা-পড়া করছে, চোখ কৌতুকে দীপ্ত, আর খুশিতে। সেই নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতো উপরে, দৌড়ে নামতো : সহজ, স্বচ্ছন্দ, দ্রুত—সে-যুগের পক্ষে অত্যন্ত অ-মেয়েলি তার চলাফেরা। মহিলাজনোচিত বৈকালিক প্রসাধন-সম্বন্ধে তার একটা স্বাভাবিক—বা অস্বাভাবিক—ঔদাসীন্য ছিলো ; মা অনেক ব'কে-ব'কেও এ-বিষয়ে তাকে যথেষ্টমাত্রায় সচেতন করতে পারেননি। অসময়ে, অশোভনভাবে অলস হ'তে পারতো সে : কোত্থেকে সে সংগ্রহ করেছিলো একটা দড়ির দোলনা—সারাটা বিকেল হয়তো কাটিয়ে দিলো তাতে শুয়ে, কিছু না-ক'রে।

কখনো আসতো ছাদে—আর হঠাৎ আমার চোখে সন্ধ্যা অনেক বেশি সুন্দর হ'য়ে উঠতো। যেন বিশ্বপ্রকৃতি ব্যক্তিগত হ'য়ে উঠতো, আমার অন্তরঙ্গ। আকাশ আর স্তব্ধ নয়। সদ্যোজাত রাত্রি ভ'রে গেছে কানাকানিতে। আর তারাগুলির মুখের ভাব এমন যেন তারা কী জানে, জানে, কিন্তু বলবে না, মুখ টিপে হাসছে তাই।

এক বিকেলে সে এলো, খোঁপা-বাঁধা মাথা, খয়েরি শাড়ি পরনে, হালকা একটু কাজলের রেখা চোখে। এটুকু প্রসাধনে

তার পরিবর্তন আশ্চর্য লাগলো আমার চোখে। কথা বলতে পারলুম না। সে বললো, 'এই—চলো একটু বেড়িয়ে আসি।'

'এখন!' আমি প্রতিবাদ করলুম, 'এখন কোথায় যাবে? একটু পরেই তো সন্ধে।' (দেশে তখন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে—মেয়েদের 'মুক্তি'র তখনও দেরি ছিলো। ভদ্রজাতীয় মেয়েরা কোন সময়ে, কী অবস্থায় এবং কার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোতে পারে, সে-বিষয়ে খুব সূক্ষ্ম ছিলো আইন-কানুন। তবে আমাদের বাড়িতে তার অত কড়াক্কড় ছিলো না: কেননা বাবা ছিলেন ইংরেজিনবিশ এবং সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। তার উপর, কল্যাণকুমার গেছেন বিলেত: প্রচলিত প্রথা অন্তত আংশিকরূপে অস্বীকার করবার সেটা একটা নৈতিক সমর্থন।)

'হ'লোই বা সন্ধে', মায়া হেসে উঠলো, যেন সন্ধে হওয়াটা খুব একটা হাস্যরসাত্মক ঘটনা, 'বেশি দূর না-গেলেই হবে। ধরো—ট্র্যামে চ'ড়ে একটু যদি ঘুরে আসি?'

নিছক অবিশ্বাসে আমি মুচকি হাসলুম। যে-সব মেয়েরা তখন অবাধে বাড়ি থেকে বেরোতেন—বেরোতেন বাড়ির জুড়ি-গাড়ি চ'ড়ে—তাঁরা নিদারুণ অভিজাত, তাঁদের সম্বন্ধে কে কী বলবে! কিন্তু ট্র্যাম!

'চলো না!'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি মাথা নাড়লুম।

মায়া একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'কেন? ট্র্যামে গেলে কী হয়?'

সত্যি, কী হয়? কেন নয়—কেন তাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বো না—এই ঝিলিমিলি সন্ধ্যায়, কেন ট্র্যামে ক'রে যাবো না চৌরঙ্গিতে, গঙ্গার ধারে? মনে-মনে আমি তার ছবি দেখলুম—গঙ্গার আর সূর্যাস্ত-লাল আকাশের পটভূমিকায়—পশ্চিমে আগুন, সূর্যাস্ত জ্ব'লে উঠেছে তার খয়েরি শাড়িতে আর কালো চুলে। রক্তে লাগলো বিদ্রোহের দোলা—মুহূর্তের জন্য। তার পরেই জয় হ'লো সাবধানতার: চিন্তা ছাড়া অন্য যে-কোনো ব্যাপারে আমি চিরকাল অত্যন্ত সাবধানী।

মায়া মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে ব'লে উঠলো 'নাঃ, তুমি একটা—'

'একটা—কী?'

মায়া হেসে ফেললো।—'সত্যি, তুমি ও-রকম কেন?'

'আমি কী-রকম?'

'তোমার ইচ্ছে করে না—'

'কী ইচ্ছে?'

'এই—বেড়াতে?'

'বেড়িয়ে কী হবে?'

'কী ক'রেই বা কী হবে? সব সময় বাড়ি ব'সে থেকেই বা হবে কী?'

'বাড়ি ব'সে থাকতেই সবচেয়ে ভালো লাগে আমার। কী চমৎকার এই ছাদ।'

বেশি। সেই ছড়িয়ে-পড়া উচ্ছ্বাসকে গুটিয়ে আনতে অনেক সময় লাগতো তাঁর। আর সেই চিঠিগুলি যখন লিখতেন, তখনই তিনি সবচেয়ে সুখী, তখনই তাঁর পরিপূর্ণতম বাঁচা। শুধু সেটুকু সময়ই যেন তিনি নিজের ভিতর থেকে জেগে উঠতেন : তাঁর মন ডানা মেলতো প্রবাসী স্বামীর উদ্দেশ্যে—নিজেকে তিনি ঢেলে দিতেন, স্ফটিকপাত্রে সুরার মতো, তুলে ধরতেন স্বামীর অধরে—কথার ভিতর দিয়ে, কথার ভিতর দিয়ে যতটা সম্ভব। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য, সুখের জন্য উদ্বেগের অন্ত ছিলো না মা-র : বাবাও,-এমনকি, তাঁকে নিয়ে যেতেন মাঝে-মাঝে স্বদেশী মেলায়, কি বিলিতি থিয়েটারে (কলকাতার ইংরেজদের তখন পর্যন্ত এমন দুর্গতি হয়নি যে ইচ্ছে করলে মাঝে-মাঝে ইংরিজি নাটক দেখা না যেতো)—তাঁর মন ভালো করবার জন্য। তাঁর মন ভালো করবার জন্য বাড়িতে এলো টকটকে লাল চোঙওলা এক গ্রামোফোন : মর্ম-বিদারক। একটা রেকর্ড চড়ালেই অপর্ণা-দির মাথা ধরতো। অবশ্য এমনিতেও মাথা ধরতো তাঁর—প্রায়ই। প্রায়ই তিনি মাথা ধরায় দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগ করতেন—নীরবে, আদর্শ ধৈর্য নিয়ে। মুখে কখনো অভিযোগ করতেন না : মাথায় শক্ত ক'রে রুমাল বেঁধে ঘর অন্ধকার ক'রে প'ড়ে থাকতেন—কুঁকড়ে ছোটো হ'য়ে, বিছানায় বালিশে প্রায় মিশে গিয়ে। তাঁর এই মাথা-ধরার বহুতর প্রতিষেধক চেষ্টা করা হ'লো—কিন্তু ফিরে-ফিরে মাথা তাঁর ধরবেই। বিয়ের আগে তাঁর কোনো অসুখ-বিসুখ দেখা যায়নি ; তবে কি স্বাস্থ্য তাঁর

আসলে ভালো না? না কি কোনো রোগে ধরলো? লক্ষণ প্রকট হ'তে লাগলো ক্রমে-ক্রমে—খেতে পারেন না, গা-বমি-বমি করে, কোনোখানে একবার বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। তাঁর গালের আর স্বচ্ছ কপালের গোলাপি আভা পুরোনো মোমের মতো ফ্যাকাশে হ'য়ে এলো; তাঁর মুখ যেন আকারে ছোটো হ'য়ে গেলো, কোনো ছোটো মেয়ের মুখের মতো। মা অপর্ণা-দিকে লক্ষ্য করলেন, প্রশ্ন করলেন। বলা বাহুল্য, এগুলি রোগলক্ষণ মনে হ'লো না তাঁর, তবু শঙ্কার ছায়া পড়লো মুখে, ডাকা হ'লো ডাক্তার। আর তারপর থেকে ডাক্তারের আসা-যাওয়া নিয়মিত চলতে লাগলো।

অত ভয়ের কারণ অবশ্য ছিলো না, কিন্তু আমাদের মন সব সময়ই যে যুক্তি মেনে চলে না, আমার মা-কে দেখে তখন বুঝেছিলাম। আশঙ্কায় তিনিই যেন ম্লান হ'য়ে গেলেন। ভালোবাসার মতো জ্বালা আর নেই। তার উপর, এই ডবল দায়িত্ব। একদিকে তাঁর 'ভাই'—কত দূর, কত দূর থেকে সে তাকিয়ে আছে এই বাড়ির, এই বাড়ির একটি মানুষের দিকে—সেখানে মা-র স্নেহের টান। অন্যদিকে তাঁর দেবর—যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আসামের মাটি খুঁড়ে পয়সা কুড়োচ্ছে—সেখানে কর্তব্যের ভার। কিছুতেই তিনি যেন যথেষ্ট ক'রে উঠতে পারছেন না। অপর্ণার শরীর দুর্বল, তার উপর প্রকৃতি ভীরু। কে জানে কী হয়, প্রতি মুহূর্তে মা-র হৃৎপিণ্ডে স্পন্দিত হ'তে লাগলো, কে জানে কী হয়। যদি ও না বাঁচে, যদি ও না বাঁচে! ও এত সুন্দর, মনে-মনে

তিনি কখনো হয়তো বলেছেন, ও কি বাঁচবে? পরমুহূর্তেই নিজের এই চিন্তার জন্য নিজেকে তিরস্কার ক'রে বলেছেন, এ আমি কি ভাবছি? এ এমন একটা কী। এতকাল ধ'রে এত মেয়েই তো—তারা কি মরেছে? কিন্তু কেউ-কেউ মরেছে তো। তা হোক, তবু—এখন নয়, হে ঈশ্বর, এখন নয়; যদি ওকে মরতেই হয়, তাহ'লে এখন নয়—পরে, যখন ও নিজের জীবনকে নিজের হাতে পেয়েছে; জীবনের পরিপূর্ণতার, সুখের, সৌভাগ্যের পরিমণ্ডলে। পরে, এই প্রার্থনার কথা স্মরণ ক'রে মা-কে অনেক কাঁদতে হয়েছিলো।

অপর্ণা-দির আহার, বিশ্রাম, ঘুম—তাঁর গল্প করা, বেড়ানো, আমোদ—যে-কোনো খুঁটিনাটি, সব নিখুঁত নিয়মে ডাক্তারের বিধান অনুসারে চলতে লাগলো। তাঁকে যত পেটেণ্ট ওষুধ আর কবরেজি বড়ি গেলানো হয়েছিলো, কোনো মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ভালো হ'তে পারে না। আর নানারকম দৈহিক উপদ্রবে তিনি ভুগতেনও কম না। এক-এক রাত্রে তাঁর ঘুম হ'তো না, মাঝরাতে উঠে পাইচারি করতেন বারান্দায়। মা উঠে আসতেন শব্দ পেয়ে—তাঁকে নিয়ে যেতেন বিছানায়, তাঁর পাশে শুয়ে শিশুর মতো ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতেন। যা-কিছু তিনি মুখে দেন, কিছুই ভালো লাগে না, মা-কে উদ্ভাবন করতে হ'তো রন্ধন-শিল্পের অপূর্বতম, অনভ্যস্ততম উদাহরণ। তাঁর বুক ঢিপঢিপ করে, বুকের ভিতরটা শূন্য মনে হয়; মাঝে-মাঝে খামকা ভয়-ভয় করে—চমকে ওঠেন হঠাৎ কোথাও

একটু শব্দ হ'লে। মায়ার তাঁর সঙ্গে শোবার ব্যবস্থা হ'লো। তার উপর ভার পড়লো বৌদির সঙ্গে গল্প করার, তাঁর মন ভালো রাখার—খানিকটা আমার উপরেও। অস্বস্তি আমারই সবচেয়ে বেশি।

পরিচর্যার প্রয়োজন ছিলো অপর্ণা-দির; বড়ো কষ্ট পাচ্ছিলেন। মাতৃত্বের সম্ভাবনা তাঁর মনে যেন আশা কি আনন্দ কিছুই আনতে পারেনি। এর জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, যেন হিশেবের মধ্যে ধরেননি এটাকে। এ যেন একটা বাধা, একটা ছেদ। নতুন জীবনকে পৃথিবীতে আনতে গিয়ে তিনি নিজেই যেন জীবন থেকে চ্যুত হ'য়ে পড়লেন। ম্লান, আরো ম্লান, তিনি যেন হ'য়ে উঠলেন নিজেরই ছায়া। মৃত্যুর আতঙ্ক তাঁর হৃৎপিণ্ডের উপর লৌহমুষ্টির মতো: প্রতি মুহূর্তে তিনি রুদ্ধশ্বাস। তিনি কেবলই ভাবতেন যে তিনি আর বাঁচবেন না। যেন নিশ্চিত জানতেন যে মরবেন। সত্যি বলতে, যেন মন স্থির ক'রে ফেলেছিলেন এ-বিষয়ে। যখন কারো মুখের দিকে তাকাতেন, তিনি তো তার মুখ দেখতেন না, দেখতেন সেই অজ্ঞাত নিরবয়ব নির্মম ভয়, শুধু একটা অজ্ঞাত ভয়—তাঁর সন্তানের সম্ভাবনা। একটা অন্ধ, আদিম শক্তি—তাঁর জীবন নিংড়ে বের ক'রে নিতে উদ্যত। এ কি জন্ম, না মৃত্যু?—মৃত্যু!—ওখানেই তাঁর ভাবনা থেমে যায়, মুহূর্তের জন্য মৃত্যুকে যেন অনুভব করেন নিজের মধ্যে, নিজের দেহের মধ্যে।

কল্যাণকুমার খবর পেয়ে লিখলেন, ঠিক যেমন আশা করা

গিয়েছিলো, অসাধারণ দীর্ঘ এক চিঠি। সন্তান যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকে পুণ্যময় ক'রে তোলে, বিবাহের সামাজিক চুক্তির উপর তা যে ঈশ্বরের স্বাক্ষর—প্রথমে এই মর্মে দুই প্যারাগ্রাফ। তারপর সন্তান-পালনের গুরুতর দায়িত্বের কথা। এলোমেলো, আন্দাজি গোছের লালন হ'লে চলবে না—যেমন আমাদের দেশে সাধারণত হ'য়ে থাকে। এ-ভার সমস্ত জাতির। সমস্ত জাতির একটা বিশ্বাসস্থল তাঁদের কাছে রক্ষিত। একে দেখতে হবে অন্যের গচ্ছিত ধনের মতো। অপব্যয় করলে চলবে না, শতগুণে বর্ধিত ক'রে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর তাঁদের নিজেদের জীবনের আদর্শের কথা—কী ক'রে সন্তানকে তার মধ্যে মিলিয়ে নেয়া যায়, কী ক'রে তার ভিতর দিয়ে ঐশ্বর্য আসবে তাঁদের নিজেদেরও জীবনে। পরিশেষে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ : ভালো বই পড়বার, সুন্দর ছবি দেখবার, মহৎ চিন্তা করবার তাগিদ। তখন পর্যন্ত সভ্য জগতে এই কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো যে কোনো অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক যদি রোজ রাফাএলের ছবি ছাখে আর দান্তের কবিতা পড়ে, তাহ'লে তার সন্তান অপরূপ ফ্লরেনটাইন অবয়ব নিয়ে পৃথিবীতে এসে আত্মার্দ্রবকারী কাব্য সৃষ্টি ক'রে যাবে।

এ-ধরনের চিঠি একটার পর একটা আসতে লাগলো। দেখতে-দেখতে সময় এলো ঘনিয়ে।

বাড়িতে একটা থমথমে ভাব : ধনুকের ছিলা কানে-কানে টানলে যেমন হয়, আমাদের সবারই প্রায় সেই অবস্থা। এটা

সংক্রামক। আমরা সবাই ফিশফিশ ক'রে কথা বলি; যতদূর সম্ভব কম শব্দ ক'রে চলাফেরা করি। মায়া পর্যন্ত একটু বিমর্ষ। যদিও আমার উপর আংশিক ভার ছিলো অপর্ণা-দির চিত্তপ্রফুল্লতা সাধন করবার, সে-সময়টায় তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব কমই হ'তো। তাঁর সেই হলদে-হ'য়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকালে অসহ্য লাগলে আমার, দূরে-দূরেই থাকতুম।

এক রাত্রে খাওয়ার পরে বারান্দা পার হ'য়ে নিজের ঘরে যেতে-যেতে অপর্ণা-দির ঘরের দিকে আমার চোখ পড়লো। একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন, আর তাঁর পাশে নিচু একটা মোড়ায় মায়া ব'সে। ঘরে আলো কম; শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছে অপর্ণা-দির মাথার পিছনে টিপয়ের উপর। ঘরটা অস্পষ্ট, যেন স্বপ্নে ভরা।

আমি চ'লে যাচ্ছিলুম, মায়া ডাকলো, 'এই।'

থমকে দাঁড়ালুম দরজার কাছে। মায়া আমার দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে বললো, 'এসো না।'

গেলুম ভিতরে। একটা অদ্ভুত গন্ধে ঘরটা আচ্ছন্ন। ফুলের গন্ধ, না চুলের গন্ধ, না স্ত্রী-সত্তার সৌরভ? ভারি আশ্চর্য লেগেছিলো সেই মুহূর্তে।

মোমের ম্লান আলো ঘরের জিনিশপত্রের বড়ো-বড়ো অদ্ভুত ছায়া ফেলেছে। যতটা সম্ভব ছায়ায় মিশে গিয়ে আমি মেঝের উপর বসলুম।

অপর্ণা-দি বললেন, 'একটু স'রে এসো, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

আমি নড়লুম না। জিগেস করলুম, 'কেমন আছো, দিদি?'

'বড়ো গরম আজ, না?'

তিনি যেন ভিতরে-ভিতরে ছটফট করছেন; মাঝে-মাঝে একটু-একটু কথা বলছেন আস্তে-আস্তে। মায়া চুপ। ও কেন আমাকে ডাকলো, আমি ভাবলুম। হয়তো শুধু আর-একজনের উপস্থিতির উষ্ণতার জন্য। মোমের প্রেত-আলোয় মায়াকেও যেন অসুস্থ দেখাচ্ছিলো।

অপর্ণা-দির মাথা ধরেছিলো; খানিক চোখ বুজে থেকে তিনি যেই চোখ খোলেন—অস্পষ্ট, ঘুমন্তভাবে—সেই দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে শুধু শারীরিক কষ্ট। তাঁর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে আমার তখন সত্যি ভয় হ'লো তিনি ম'রে যাবেন।

মায়া উঠে গেলো বৌদির শোবার আগের গরম দুধ আনতে। অপর্ণা-দির একখানা হাত চেয়ারের পাশে এলিয়ে পড়েছিলো—তিনি তা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। নিঃশব্দে, তাঁর হাতের মধ্যে একখানা হাত সমর্পণ করলুম।

আমার হাতের উপর মৃদু চাপ দিয়ে অপর্ণা-দি বললেন, 'নীল, আমি আর বাঁচবো না।'

'এ-সব কেন বলছো, দিদি?'

'নীল, আমি ম'রে গেলে তুমি আমাকে মনে রাখবে?'

আমি কথা বললাম না।

'বলো না।'

আমি চোখ তুললাম তাঁর দিকে। তিনি কি আমার চোখে তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন, তাই কি বললেন: 'আমি জানতুম—জানতুম যে তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমি ম'রে গেলেও কি ভালোবাসবে?' তাঁর দুই চোখ যেন সেই আধো-অন্ধকারে কী খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কষ্টে বিস্ফারিত তাঁর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আবার তাঁর মৃত্যুতে প্রায় বিশ্বাস করলুম।

কিন্তু তিনি মরলেন না; যে-শিশুটি ভূমিষ্ঠ হ'লো, সে, দেখা গেলো, মৃত। অবিশ্রান্ত মৃত্যুর চিন্তা ক'রে-ক'রে তিনি তাঁর সন্তানের উপর মৃত্যু ডেকে আনলেন। মৃত্যু এসেছিলো তাঁর কাছে, কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁরই জীবনের অংশ এক দ্বিতীয়, এক নতুন প্রাণের উপর পড়লো। বিনিময়টা মন্দ না। কিন্তু অপর্ণা-দি নিজেও প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি এসেছিলেন। ব্যাপারটা দীর্ঘ, অসহ্য তার কষ্ট। প্রসবের ব্যথা আরম্ভ হয়েছিলো সন্ধের একটু পরে। রাত আটটা থেকে তিনটে পর্যন্ত অপর্ণা-দি—যাঁকে কখনো একটু চেঁচিয়ে কথা বলতে শোনা যায়নি—চীৎকার করলেন, যেন প্রতি মুহূর্তে কেউ তাঁকে খুন ক'রে ফেলছে। মাঝে-মাঝে মূর্ছিত হ'য়ে পড়েন, জেগে উঠেই আবার চীৎকার, যতক্ষণ না আবার জ্ঞান হারিয়ে যায়। রাত তিনটের পর তাঁর চেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'লো। সেই রাত্রে আমি সহস্র বার নিজের মনে বলেছি

যে, অপর্ণা-দি মরবেন, অপর্ণা-দি মরছেন। ভোরের দিকে ফরসেপস-এর সাহায্যে এতদিনের এত আতঙ্ক, এত যন্ত্রণার হেতুকে মুক্তি দেয়া হ'লো। মেয়ে। মা বলেন তার চুল ছিলো অপর্ণা-দির মতো ঘন আর কোঁকড়া। দেখতে সে ভালোই ছিলো, একমাত্র দুঃখের কথা এই যে জন্মাবার আগেই ম'রে গিয়েছিলো। মৃত একটু মাংসপিণ্ডের জন্য এত!

যাক, বাঁচা গেলো। অপর্ণা-দি যে মুক্তি পেয়েছেন, তাতেই সবাই খুশি ; মেয়ের কথা কারো একবার মনেও হ'লো না। কিন্তু শুনেছি, অপর্ণা-দি নিজে যখন শুনলেন যে মরা মেয়ে হয়েছে, তিনি কেঁদেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত তা মেয়ের জন্য নয়। তা তাঁর স্বামীর কথা ভেবে—স্বামী এ-খবর পেয়ে দুঃখিত হবেন, নিরাশ হবেন ব'লে। স্বামী ওকে পেয়ে খুশি হবেন, এ ছাড়া তাঁর শিশুর আর-কোনো অর্থ ছিলো না তাঁর কাছে।

সেরে উঠতে অপর্ণা-দির বেশি সময় লাগলো না। মৃত্যুর এত কাছ থেকে ফিরে এসে, তাঁর সমস্ত সত্তা চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে জীবনকে ক্ষুধিতভাবে আঁকড়ে ধরলো, শোষণ ক'রে নিতে লাগলো। আর গোলাপ ফুটে উঠতে লাগলো গালে। চোখে জ্ব'লে উঠলো নীল আগুন। মৃত্যুর আঁচলের হাওয়া তাঁকে যেন আরো বেশি সুন্দর ক'রে দিয়ে গেলো। তিনি হঠাৎ আলোতে আপ্লুত হ'য়ে উঠলেন, আর আনন্দে। ঢেউ এসে লাগলো সেই আনন্দের আমার মনে, আর মায়ারও। সেখানে আমি আর মায়া এক হ'য়ে উঠতে লাগলুম।

৫

কাটলো এক বছর। মায়ার সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রথম বছর। তারপর—তার পরের কথা কী বলবো? আশ্চর্য—সেই এক বছরের মধ্যে আমরা দু'জনেই মনের দিক থেকে কী-রকম বেড়ে উঠেছিলাম। কী-যেন—কী-যেন একটা ঘটছিলো—শরীরে, মনে, আকাশে, সমস্ত বিশ্বে। কিন্তু সেই বিশ্বের কেন্দ্র আমাদেরই মধ্যে। কিসের প্রবল ঝাঁকুনি লাগলো আমাদের সত্তার গোপনতম মূলে—আমরা বদলে গেলাম—না, রূপান্তরিত হ'য়ে উঠলাম। নতুন জীবন, নতুন জগৎ। ছেলেমানুষির দিন গেছে, ছেলেমানুষির স্বর্গ থেকে আমরা ভ্রষ্ট। আমাদের এই নতুন সচেতনতাকে কি সুখের বলবো? কোনো সন্দেহ নেই—তার মধ্যে যে জীবনের সবচেয়ে বড়ো আনন্দের উৎস, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু শুধু তা-ই নয়, কেবলই আনন্দ নয়। তার সঙ্গে অনেক বেদনার, অনেক পরস্পর-বিরোধী অনুভূতির মিশোল। একটার সঙ্গে অন্যটা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—বেছে নিয়ে সাজানো অসম্ভব। বাসনার, হতাশার, উন্মাদনার, কাঁপা-কাঁপা চোখের, ঠোঁটের উপর হঠাৎ থমকে-যাওয়া কথার, অস্পষ্ট প্রতীক্ষার, আঘাতের, অভিমানের, বাণীময় নীরবতার একটা বিশাল স্পন্দমান বিশৃঙ্খলা। কিছুই আর সহজ নয়। আর সহজ নয় মায়ার পক্ষে সকালবেলার চা

ঘিয়ে আমার ঘুম ভাঙানো, সহজ নয় আমাদের কাছাকাছি আসা, সন্ধ্যায়-ভ'রে-যাওয়া ছাদে দাঁড়িয়ে গল্প করা, পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠা। সব বদলে গেছে। সব—সব এমন গূঢ় ইঙ্গিতময় যে অনায়াসে কিছুই আর নেয়া যায় না; অতি সামান্য একটু ভঙ্গিতেই যেন বুকের ভিতরটা ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে। মুখের কথা—তা যেন মন্ত্রের মতো ধ্বনিময়; একটু হাতের উপর হাত রাখা—তা যেন কোনো যজ্ঞের অনুষ্ঠান। যেন কোনো অজ্ঞাত অন্ধকার হিংস্র যজ্ঞ—তাতে আমরা উৎসর্গিত। যেন ভয়, কেন ভয় করে। মায়ার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ভয়; ভয় করি তার চোখের অতল অন্ধকার রহস্যকে। আশ্চর্য, আমরা যাকে ভালোবাসি, সেই ভালোবাসাই তাকে আড়াল করে।

পৃথিবীতে এমন দুর্ভাগা কেউ নেই যার জীবনে একবার বসন্ত না এসেছে। আমারও বসন্ত এসেছিলো—কলকাতার গলির উপর সেই বাড়িতে, রাস্তার ধারের সরু বারান্দায়—এসেছিলো আকাশ ভ'রে, সমুদ্রে ঢেউ তুলে, পায়ের নিচে রাশি-রাশি ফুল ছড়িয়ে—সংগীতে, সৌগন্ধ্যে, স্বপ্নে, বিহ্বলতায়। কল্যাণকুমার ফিরে আসবার আগে সেই একটি বছর! তা এত সুন্দর যে অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমার মরতে ইচ্ছা করেছে। আমি জানতুম এ থাকতে পারে না। একে মরতেই হবে। আমরা শুধু তৈরি ক'রে যাচ্ছি নিজেদের সর্বনাশের পথ। ওকে ছেড়ে কী ক'রে বাঁচবো,

এক-এক রাত্রে বালিশের উপর মুখ চেপে ধ'রে রুদ্ধশ্বাসে, অর্ধ-স্ফুট স্বরে আমি বলেছি, ওকে ছেড়ে কী ক'রে বাঁচবো? আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পেতুম সেই অন্তিম ধ্বংস, শেষ ভয়াবহ উচ্ছেদ। অন্ধকারে, আতঙ্ক যেন একটা হাড়ময় হিম হাত বাড়িয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরতো। আমি কী করতে পারি, হতাশার অতলতা থেকে রাত্রিকে, বাতাসকে, বালিশকে, ঘরের জানলাকে, ঈশ্বরকে আমি প্রশ্ন করতুম, আমি কি কিছু করতে পারি? আমি প্রশ্ন করতুম—মানুষের অজ্ঞানতায়, অন্ধতায়। ঠিক কোন পথ ধ'রে সর্বনাশ আসবে, আমার পক্ষে তখন কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না।

রাস্তার ধারের সেই সরু বারান্দায় আমরা তিনজন—অপর্ণা-দি আর মায়া আর আমি—বাড়ির মধ্যে সেই জায়গাটাই আমরা বেছে নিয়েছিলাম, বারান্দাটা অত সংকীর্ণ ব'লেই, অত কাছাকাছি, নিবিড়ভাবে পরস্পরকে অনুভব করতে পারতুম ব'লে। ক্যানভাসের একটা ইজিচেয়ার বারান্দার প্রায় সবটুকু প্রস্থ জুড়ে—সেখানে, কাঁধের নিচে একটা বালিশ দিয়ে অপর্ণা-দি, মায়া বসেছে রেলিঙের কার্নিশে, কোলের উপর দু'হাত একত্র করা, শাদা আঁচলটা খ'সে পড়েছে কাঁধ থেকে। রেলিঙে ভর দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখছি, নিশ্বাস নিচ্ছি। আকাশে সন্ধ্যা, আকাশে বাঁকা চাঁদ। হাওয়ায় একটা গন্ধ...বসন্তের গন্ধ। মুহূর্তগুলো স্বচ্ছ নিটোল স্ফটিক-বিন্দুর মতো চিরকালের গহ্বরে ঝ'রে-ঝ'রে পড়ছে। আর

সেখানে আমরা থাকতুম, কথা বলতুম যতক্ষণ না চাঁদ হেলে পড়তো পশ্চিমে, দূরের একটা বাড়ির চিলছাদের পিছনে, তামাটে-লাল হ'য়ে। যতক্ষণ না হাওয়া উঠতো শিরশির ক'রে, অদৃশ্য শিশিরে।

আর-কিছু মনে পড়ে না। শুধু এই ছবি মনে পড়ে, আর হঠাৎ মাঝে-মাঝে রাত্রির হাওয়ায় বুকে এসে লাগে সেই বসন্তের গন্ধ। বুকের উপর আছাড় দিয়ে বলে, 'খোলো।' আঘাত করে স্মৃতির দরজায়। বুকের হাড় ব্যথায় যেন ভেঙে যায়।

জীবনে আমি অনেক ভালোবাসার গল্প লিখেছি, কিন্তু এই ভালোবাসার কথা কখনো লিখতে পারবো না। আমার আর মায়ার এই ভালোবাসা—তাতে এতই সূক্ষ্ম আলো-ছায়ার টানা-পোড়েন, তা এমনই কোমল, পলাতক, মুহূর্তের ভঙ্গুর বৃন্তে টলোমলো যে ভাষার জালে তাকে বাঁধবার আশা কখনোই করিনি। সেই সময়ে মায়ার চোখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমি প্রথম উপলব্ধি করি যে ভাষা নেই। না, ভাষা নেই। আমরা শুধু বোবা চোখে তাকিয়ে থাকতে পারি, শুধু ভাবতে পারি, বলতে পারি না। অসীম নীরবতা দু' জনের মধ্যে। আর সেইজন্যই অপর্ণা-দিকে পেয়ে আমরা খুশি হয়েছিলুম। দু' জনে যদি কখনো একা থেকেছি, অব্যক্ত বাণীর কলরোল মূর্ছার মতো কেড়ে নিয়েছে আমাদের নিশ্বাস। দু' জনে একা থাকতে ভয় করেছে। স্বর্গকে লক্ষ ধন্যবাদ জানিয়েছি অপর্ণা-দির জন্য। তাঁর মধ্যস্থতায় সহজ লাগতো। তাঁকে উপলক্ষ্য

ক'রে আমরা পরস্পরের মুখোমুখি হ'তে পেরেছিলুম। তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হ'তে পেরেছিলুম দু' জনে দু' জনের কাছে। ভাষা ছিলো না: আমার নীরবতা থেকে মায়ার নীরবতায় অপর্ণা-দি ছিলেন দোভাষী।

কল্যাণকুমার

১

কল্যাণকুমার ফিরে এলেন। অমন জমকালো কোনো মনুষ্যমূর্তি আগে কখনো দেখিনি। পুরো তিনটে মানুষের জীবনীশক্তি তাঁর মধ্যে। স্বাস্থ্যে ফেটে পড়ছে শরীর। বিলেতের তুষার তাঁর মুখের হলদে আভায় লালের ছোঁওয়া দিয়েছে। আরো গাঢ় হয়েছে কণ্ঠস্বর। ঢোলা অক্সফোর্ড ইজেরে, ইংরেজি ছাঁদের দীর্ঘ সমান পদক্ষেপে, পাইপ মুখে নিয়ে কাটা-কাটা কথার উচ্চারণে, তাঁর গায়ে, জামা-কাপড়ে একটা সর্বব্যাপী অনির্ণেয় বিলেতি গন্ধে—সব জুড়িয়ে তিনি বর্ণময়, গতিতে ভঙ্গিতে শক্তিতে প্রদীপ্ত। অবাক হয়েছিলুম প্রথম তাঁকে দেখে, অবাক হ'লুম আবার।

স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন তিনি ফিরলেন। হৃদয় আমাদের উৎসব-উতল। যেন স্বর্গের হাওয়া লেগেছে বাড়িতে। সে-আনন্দ এমন যে তাকে ভালো ক'রে প্রকাশ পর্যন্ত করা যায় না। তাঁর রওনা হবার খবর যেদিন এলো, সেদিন থেকেই সারা বাড়িতে একটা অনির্দেশ্য চঞ্চলতা। ঢেউ উঠছে। দোলা দিচ্ছে মন থেকে মনে—ছোটো-ছোটো কথায়, চকিত দৃষ্টিতে। ঝলকে উঠছে অলক্ষিত বিদ্যুৎ। কেউ কিছু বললো না, বলা কি যায় কিছু?

অপর্ণা-দিকে আর মায়াকে নিয়ে আমাকেই যেতে হ'লো

হাওড়ায়। মা রইলেন বাড়িতে—রান্নাঘরে, অন্তহীন রান্না ক'রে যাচ্ছেন, যা-কিছু তাঁর ভাই ভালোবাসে ব'লে তাঁর মনে পড়ে। কিসের চচ্চড়ি আর কিসের শাক, কচুর কী-এক অদ্ভুতরকমের ভাজা—যত রকম ছোটোখাটো জিনিশ বাংলাদেশের রান্নাকে একটা আর্ট ক'রে তুলেছে। সেখানে শুধু নৈপুণ্য থাকলেই চলে না, কল্পনাশক্তিও চাই। রন্ধনলোকের অপরিচিত কোণঘুপচি—স্বাদের প্রীতিকর বৈচিত্র্যের সঙ্গে যেখানে উপকরণের বিস্ময়কর তুচ্ছতার মিলন। বাঙালির কল্পনা-প্রবণতা তাদের রান্নাতেও। পশ্চিমভারতীয়রা যদি শর্ষে আর শারকোল দিয়ে কচুসেদ্ধ খেতে শিখতো তাহ'লে এতদিনে তাদের মধ্যে একজন ছোটোখাটো রবীন্দ্রনাথ কি না জন্মাতেন!

মা সকাল থেকে এই সব খুঁটিনাটি রান্না করছেন, এক-এক ক'রে, অসাধারণ যত্ন নিয়ে। আমি দেখেছি, মেয়েদের মনে যখনই কোনো আবেগের চাপ পড়ে, তারা আশ্রয় নেয় রান্নাঘরে। তারা কথা বলতে পারে না, ভাব নিয়ে বিলাস করবার সময় তাদের নেই, রান্নাতে তারা মুক্তি পায়। রান্নার ধোঁয়ায় ভুলে' থাকতে পারে আবেগ, ধোঁয়া-পরদায় লুকিয়ে রাখতে পারে নিজেদের, আবেগ সহ্য করবার এমন একটা চমৎকার উপায় আছে ব'লেই বোধহয় কবি হওয়া তাদের হ'লো না!

প্ল্যাটফর্মে আমরা দাঁড়িয়ে আছি—গাড়ি আসতে মিনিট দশেক বাকি। ভারি বিশ্রী কাটলো সেই সময়টুকু। অপর্ণা-দি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন কৌতূহলের ভাণ ক'রে।

স্টেশনের ফেরিওলাদের বিষয়ে কতই যেন তাঁর উৎসাহ; একটা-দুটো কথাও বললেন, কিন্তু ঠোঁট কেঁপে উঠলো আর তাঁর মুখের ম্লানতা গোপন থাকলো না কিছুতেই। আমার চোখ এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন—এমন ভাব দেখালেন, এইমাত্র যে-একদল পার্শি প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকলো তাদের পর্যবেক্ষণ করছেন অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে।

গাড়ি আসছে। দেখা যাচ্ছে এঞ্জিনের পুরোভাগ—ইস্পাতের কৃষ্ণচক্র। মুহূর্তের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম ভ'রে গেলো জনতায়, কলরোলে। ভারি, মন্থর আওয়াজ করতে-করতে গাড়ি এসে ঢুকলো। আমি ঠিক জানি, সেই শব্দ অপর্ণা-দির হৃৎপিণ্ডে বেজে উঠেছিলো রহস্যময় কোনো আশ্বাসের, অতীন্দ্রিয় কোনো প্রতিশ্রুতির মতো। রক্তের মধ্যে ধ্বনিত কোনো পূজার বাজনা। সেই মুহূর্তে তাঁর মন দুরাশার ডানা মেলে উড়ে চলেছিলো ভবিষ্যতের অস্পষ্ট আকাশে—সৌভাগ্যে সার্থকতায় ঝলোমলো কোনো সোনালি দিগন্তের সন্ধানে।

বিশাল, দীপ্তিময়, ইংরেজ আকৃতির এক কল্যাণকুমার হাসিমুখে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'Ah, here you are'.

মায়া এগিয়ে তাঁকে প্রণাম করলো। এক হাতে তার কোমর জড়িয়ে সস্নেহ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'Why did you do it?'

মায়া একটু লাল হ'য়ে উঠলো, বললো না কিছু।

তারপর আমার কাছে এসে কাঁধ ধ'রে তিনি এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে আমার প্রায় নিশ্চিত ধারণা জন্মালো কোথাও-না-কোথাও দুটো একটা হাড় ভেঙেছে।—'কেমন আছো, নীল ?'

কাঁধে একবার হাত বুলিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করলুম।

'তারপর—অপর্ণা, অমন শুকনো দেখছি যে তোমাকে ?'

অপর্ণা-দি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে এইবার তিনি তাঁর নরম-নীল চোখের দৃষ্টি স্বামীর দিকে তুলে ধরলেন, শূন্যের মাঝখানে হঠাৎ ফুটে-ওঠা কোনো আশ্চর্য নীল ফুলের মতো। পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে কল্যাণকুমার মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, 'Come along, let's move'.

'কুলিরা মাল তুলতে লাগলো মাথায়। কল্যাণকুমার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা এগোও—আমি আসছি।'

২

এই ক্ষুদ্র ইতিহাসে দ্বিতীয়বার, মূর্তিমান বিপ্লবের মতো, আস্ত একটা ঝড়ের মতো কল্যাণকুমার আমাদের উপর ভেঙে পড়লেন। একবার আমার চোখে তিনি লেগেছিলেন—এপিকের ভয়াল জগৎ থেকে উত্থিত কোনো দানবের মতো। আবার তাঁকে দেখলুম—তাঁর আসুরিক শরীর আর দুর্দান্ত প্রাণশক্তি নিয়ে—তাঁর গায়ে দূর দেশের গন্ধ, জ্বলন্ত সভ্যতার প্রেরণা, পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের ছন্দে স্পন্দিত তাঁর রক্ত। উদ্দীপ্ত ইওরোপ, প্রাণময় পৃথিবী, যে-জগৎ কর্মে সাধনায় মনুষ্যধর্মে মহান—এবার আমার চোখে তার প্রতীক হলেন তিনি। তিনি আমার কাছে নিয়ে এলেন—এবার আর পুরাণের হত্যার আর ক্ষমার সৌন্দর্য নয়—সমসাময়িক পৃথিবীর নির্মাণের আর ধ্বংসের, অভীপ্সার আর আহুতির ভয়ংকর বিস্ময়। আমি রোমাঞ্চিত হলুম। সে-সময়টা ছিলো ইওরোপীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ। ইওরোপকে আমরা তখন গভীরভাবে বিশ্বাস করতুম; আমাদের প্রাচ্য শৈথিল্য থেকে তাকিয়ে থাকতুম তার মুখের দিকে। স্বীকার করতুম বিজ্ঞানের দেবত্ব। প্রথম প্রলয়ের কিছু দেরি ছিলো তখনও: বিজ্ঞানের প্রতিটি মির‍্যাকল-এর সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সুখের আনুপাতিক বৃদ্ধিতে সন্দেহ করবার তখন পর্যন্ত কোনো কারণ ঘটেনি।

ইওরোপকে এতদিন জেনেছিলুম ছাপার অক্ষরের ভিতর

দিয়ে, ভাবলোকের অগ্নিবাষ্পে। কল্যাণকুমার দিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ। বয়স তখন অল্প আমার, কল্পনা দুরন্ত। আমার সমস্ত আত্মা ধাবিত হ'লো তাঁর দিকে। মনে-মনে তাঁকে পূজা করতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু তাঁকে নয়—এ-পূজা তাঁকে নয়। পূজা আমার মানসী প্রতীচীকে, ইওরোপাকে, শিশুকাল থেকে যাকে ভালোবেসেছি, যার পবিত্র যজ্ঞাগ্নি থেকে জ্বালিয়ে নিয়েছি নিজের জীবনের শিখা। আ, আমার মতো ইওরোপকে ভালোবেসেছে আর কে? বিশ শতকের প্রথম দিকে যে-বাঙালি যুবক ছিলো, তার মতো ইওরোপকে ভালোবাসবে আর কে?

কল্যাণকুমার তোলপাড় তুললেন বাড়িতে। সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেলো। কিছুদিন পর্যন্ত বাড়ি উতরোল। ফিরে এসেই তিনি আমাদের গার্হস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনে উঠে-প'ড়ে লাগলেন। সবদিকে তাঁর মন, চারদিকে তাঁর দৃষ্টি। ফার্নিচারে ভ'রে গেলো বাড়ি। টেবিল ব'সে খাওয়া চাই। বাড়িতে একটা ভদ্রগোছের ড্রয়িংরুম না-থাকলে কি চলে? কেউ এক মুহূর্ত একটু ময়লা কাপড় প'রে থেকেছে কি রক্ষে নেই। কোনো আসবাব সামান্য একটু স্থানচ্যুত হয়েছে কি তিনি ছুটলেন যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। মনে হয়, ইওরোপীয় জীবনের বাইরের সৌষ্ঠবে তাঁর চোখ একটু ঝলসে গিয়েছিলো। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সতেরো বছরের লেখা বিলাতযাত্রীর পত্রে বড়ো চমৎকার লিখেছেন। আমরা—যাদের সব সময় দশজনের হট্টগোলের মধ্যে বাস করতে হয়—বিলেতে গিয়ে যখন দেখি,

অনুমতি না-নিয়ে কেউ ঘরে ঢুকতে পারে না, তাতেই মাথা ঘুরে যায় আমাদের। উনিশ শতকে সতেরো বছর বয়েসে ইওরোপে গিয়ে যে-ছেলে এটা লক্ষ্য করতে পেরেছিলো, সে তো হবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু সবাই রবীন্দ্রনাথ নয়। বিশেষ ক'রে, কল্যাণকুমার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না।

এক আমার মা-কেই তিনি বাগাতে পারলেন না। মার রান্না করাতে তিনি যখন তুমুল আপত্তি তুললেন, মা বললেন হেসে :

'কে রাঁধবে তাহ'লে ?'

'রাঁধবে! রাঁধবার লোকের অভাব? রাঁধবার জন্যই তুমি আছো নাকি ?'

'কিন্তু আমি করবো কী ? দিন কাটবে কী ক'রে ?'

'দিন কাটাবার জন্য আবার ভাবনা।'

'ভাবনা না ? কিছু না-করলে মানুষ বাঁচে ?'

'এমন অনেক কাজ আছে, যা করলে বেশিদিন বাঁচে না।'

মা হাসলেন।—'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, তুই চুপ কর তো।'

'কিন্তু বড়ো খারাপ দেখায়, দিদি। বিশ্রী'!

'তোর মান যায় ?'

কল্যাণকুমার চুপ করলেন। মা বললেন, একটু পরে : 'যার যা ভালো লাগে সে তা-ই করবে, এর উপর আর কথা কী।'

শেষ পর্যন্ত আপোশ হ'লো। চুক্তিটা এই যে মা রাঁধুন তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁকে খেতে হবে দু' বেলা আমাদের সঙ্গে

টেবিলে ব'সে। বেলা ছুটোয় আর রাত এগারোটায় তিনি যে সবার শেষে একা ব'সে খাবেন, ও-সব চলবে না আর।

এ-সব সৌষ্ঠবসাধনে আমরা যে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করলুম, তা নয়। ঠিক যেন সইছে না, যেন মানাচ্ছে না। দক্ষিণের বারান্দায় এক সেট বেতের চেয়ার-টেবিল এলো : গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় যখন হাওয়া দেয়, আড়ষ্ট হ'য়ে চেয়ারে ব'সে সেই শুভ্র, মসৃণ শীতলপাটির জন্য আমাদের মন-কেমন করে। আর গ্রামোফোনে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত টেনরের গান কি বাজাতেই হবে, আমি মনে-মনে ভাবতুম। আমোদ-প্রমোদ বিষয়ে কল্যাণকুমার কতগুলি নির্দিষ্ট ধারণা কুড়িয়ে এনেছিলেন, সেগুলি কাজে খাটাতে লাগলেন প্রবলভাবে। আমাদের আনন্দ-বিধানে তাঁর উৎসাহ এত বেশি যে সত্যি-সত্যি আনন্দ কেউ পাচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখবার সময় কই।

কোনো সন্ধ্যায় তিনি হয়তো অপর্ণা-দিকে নিয়ে বেরোতেন, কোনো বিলিতি হোটেলে ডিনার খেতে। বিলিতি খাদ্যে অপর্ণা-দির রুচি ছিলো না, বিলিতি ধরন-ধারনে অনভ্যাস ছিলো। প্রকাশ্যতায় তিনি স্বভাবতই সংকুচিত। প্রথম যেদিন কল্যাণকুমার তাঁকে নিয়ে বেরোলেন, তিনি আপত্তি করলেন একটু।

'কাপড়-চোপড় প'রে নাও চট ক'রে, চলো', ল্যাজওলা কালো কোর্তায় সুশোভন, কল্যাণকুমার এক সন্ধ্যায় চমক লাগালেন অপর্ণা-দিকে।

'কোথায় ?' ভীরু চোখ অপর্ণা-দির।

'Let's go out. তোমার আরো বেরুনো দরকার। You mustn't be cooped up like that. চলো—ওঠো।'

'কোথায় যাচ্ছো ?'

'Spence's Hotel !' ফুর্তিতে শিষ দিলেন কল্যাণকুমার।

'আমি কী করবো সেখানে গিয়ে ?'

'কী আবার করবে ? খাবে, হাসবে, ফুর্তি করবে।'

'আমার তো ভালো লাগবে না।'

'লাগবে না ? লাগতেই হবে ! এমনি ঘরের কোণেই কাটিয়ে দেবে নাকি জীবন ?'

অপর্ণা-দি উত্তর দিলেন না।

'বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতে হবে তোমাকেও ! মিশতে হবে লোকের সঙ্গে। বলতে হবে। চলতে হবে। খেলবে, হাসবে, নাচবে।' আবার শিষ দিয়ে উঠলেন, শিষ দিতে-দিতে হেসে ফেললেন। 'নাচের নামে ভয় পেলে নাকি—ছাখো তবে—' হঠাৎ অপর্ণা-দিকে জড়িয়ে ধ'রে দু' পাক ওয়ালজ ঘুরলেন।

অপর্ণা-দি তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'আঃ !'

'বাঃ !' সঙ্গে-সঙ্গে কল্যাণকুমারের জবাব।

'কেউ দেখে ফেলতো যদি ?'

'দেখতো। নাচ তো দেখবারই। সবার সামনেই তো নাচে সবাই।'

অপর্ণা-দি মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে একটু দূরে স'রে গেলেন।—'তুমি যাও—আমি যাবো না।'

একটু সময় কল্যাণকুমার তাকিয়ে রইলেন মুগ্ধ চোখে। বাসনা তাঁর চোখে জ্ব'লে উঠলো শিখার মতো। 'Ah, you are pretty!' নরম, ভাঙা-ভাঙা গলায় ব'লে উঠলেন। তারপর ছুটে গিয়ে দু' হাতে জাপটে ধ'রে নিবিড় চুম্বন করলেন মুখের উপর। রুদ্ধস্বরে বললেন, 'Do you love me?'

অপর্ণা-দি অসহায়ভাবে বলতে লাগলেন, 'ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো!'

কিন্তু কল্যাণকুমার বোধহয় শুনলেন: 'আরো, আরো, আরো!' চোখের উপর, মুখের উপর, গলার উপর বার-বার চুম্বন করতে লাগলেন, আর ফাঁকে-ফাঁকে বলতে লাগলেন: 'Do you love me? Do you love me?'

মুহূর্তের জন্য, চুম্বন-মুহ্যমান, অপর্ণা-দি তাঁর শান্ত, নীল চোখ মেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কল্যাণকুমার বললেন উচ্চস্বরে, স্ত্রীকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে: 'Say! Say you love me. I will kill you if you say you dont'.

হঠাৎ অপর্ণা-দির যেন চমক ভাঙলো। মৃদুস্বরে বললেন, 'করছো কী? ছাড়ো।'

কল্যাণকুমারেরও যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন: 'চলো—দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।'

এ-রকম ছোটোখাটো দৃশ্য দেখা যেতো প্রায়ই। স্থানকাল

সম্বন্ধে কল্যাণকুমার বিশেষ সতর্ক ছিলেন না, চোখে পড়েছে আমাদের অনেকেরই। কল্যাণকুমার লজ্জিত হতেন না মোটেও। কিসের লজ্জা? অমন ভালোবাসা কি সোজা কথা? অমন ভালোবাসতে ক'জন পারে? প্রেম অমন প্রবল ব'লেই তো অমন অসংযত। তাঁর বাসনায় এমন ধার, তাঁর সমস্ত ভিতরটা যেন ক্ষ'য়ে যাচ্ছে। স্ত্রীকে তিনি ভালোবাসেন উন্মত্তের মতো— অমানুষিক, হিংস্র উত্তাপ নিয়ে। থেকে-থেকে ছুটে আসেন অপর্ণার কাছে। সারাদিনের মধ্যে লক্ষ অছিলায় তাকে লক্ষবার ডাকেন। ভালোবাসেন অপর্ণার শরীর, তার শরীরের সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যের কাছে দাসত্ব তাঁর। সেই প্রতিমার তিনি পুরোহিত, সেই সৌন্দর্যের উষ্ণ গোধূলি-সঞ্চারে মাতৃপিয়াসী শিশুর মতো তিনি। এই বিরাট পুরুষের মনটা যেন শিশুর মন। তাঁর ভালোবাসার বাসনার তৃপ্তি নেই। অন্তহীন ব্যাকুলতা, শান্তিহীন প্রেম।

মাঝখান থেকে, আমাদের সরু বারান্দার আড্ডা গেলো ভেঙে। আমাদের সেই মুক্তায়িত সন্ধ্যাগুলিকে কল্যাণকুমার নিজে না-জেনে টুকরো-টুকরো ক'রে ভেঙে দিলেন—যেমন কেউ ছিঁড়ে ফেলে অজান্তে, হাতের এক ভঙ্গিতে, বহুদিন ধ'রে তৈরি সূক্ষ্ম, জটিল মাকড়শার জাল। কোনো সন্ধ্যায় তিনি অপর্ণা-দিকে নিয়ে বাইরে গেছেন, কোনো সন্ধ্যায় তিনি মায়াকে ইংরিজি অ্যাকসেণ্ট শেখাচ্ছেন—কি আমাকে প'ড়ে শোনাচ্ছেন ব্রাউনিং। রাগ করতে পারি না, তাঁকে বড়ো বেশি ভালোবাসি যে।

যা-কিছু তিনি করেন, তা-ই যাতে ভালো লাগে, তারই চেষ্টা করি প্রাণপণ। কিন্তু মন কি শাসন মানে? মন তো চায় সেই সরু বারান্দার শান্ত, নিবিড় সম্মিলন, মৃদু হাসির ঢেউ-তোলা, কথা যেখানে ঝ'রে পড়ে চুপে-চুপে, শিশিরের মতো। এক-এক সন্ধ্যায় হাওয়া ওঠে উতল হ'য়ে, মন বসে না আর কোথাও। কখনো মায়ার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়—আর আমরা দু'জনেই তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিই, যেন ভয় পেয়ে।

মায়াকে আমি কি কিছু বলতে চেয়েছি? মায়াকে আমি কি চেয়েছিলুম—প্রেমিক যেমন ক'রে প্রিয়াকে চায়? কেমন ক'রে বলি, বড়োই ছেলেমানুষ ছিলাম। শুধু, মনের মধ্যে যেন অস্পষ্ট একটা ব্যথা। আমি যে তাকে চাই, এই কথাটা নিজের মনে স্পষ্ট ক'রে বলবার সাহসও ছিলো না। আমি ভীরু, আমি কবি। অন্তত, কবিতা পড়েছিলুম। পড়েছিলুম শেলি, ব্রাউনিং, সুইনবর্ন। আমার প্রিয়াকে আমি খুঁজে পেয়েছিলুম কোথায়—রাত্রির কোন অন্ধকার তোরণে, তারাময় চূড়ায়। আজও—সন্ধ্যার আলোয় যখন অতীতের ছায়াগুলি দীর্ঘ হ'য়ে পড়ছে আমার মনে—আজও আমার জন্য আকাশের শুধু তারাই রইলো।

ক্ষোভ করি না, সব সার্থক। প্রেম কি সহজে হারায়। এখনো মাঝে-মাঝে মনের জানলা খুলে যায়, রাত্রির কালো আকাশে তারার আলোর সোনালি লেখায় ফুটে ওঠে কথা। আমি তাকিয়ে আছি চুপ ক'রে। সুখ—হ্যাঁ, এ-ও এক রকমের

সুখ বইকি। তোমরা যারা বীর, যারা যোদ্ধা, যারা জয়ী, তোমরা এ-সুখ বুঝবে না।

কিন্তু সেই সময়ে—সেই সময়ে বুকের ভিতরটা মাঝে-মাঝে টনটন ক'রে উঠতো। অপর্ণা-দি ছিলেন আমাদের মাঝখানকার সেতু, সেই সেতু ভেঙে ছিলেন খর বন্যার মতো কল্যাণকুমার। সুর যেন কেটে গেলো, ছিটকে পড়লুম। কল্যাণকুমার আমাদের গ্রাস ক'রে নিলেন; আমাদের সবাইকে গ্রাস ক'রে নিলেন। সমস্ত বাড়ি ভ'রে শুধু তিনি। সর্বত্র তিনি আছেন, সব সময়। তাঁকে অতিক্রম করে নিজের জীবন দখল করতে পারি, এমন ক্ষমতা কি আমার!

আর কল্যাণকুমার থেকেও গেলেন। প্রোফেসরি তাঁর হাতের কাছে এলো অনেকগুলি—একটাও পছন্দ হয় না। চাকরির এত গরজই বা কিসের। বাবা বলেন মাঝে-মাঝে: 'যে-কোনোটায় ঢুকে পড়ো না, ভালো আর-একটা হ'তে কতক্ষণ!' না—কল্যাণকুমার মাথা নাড়েন। মনের মতো কাজ না-পেলে কেন করবেন? কিছুদিন না-হয় বিশ্রামই করলেন বাড়ি ব'সে।

৩

বিনয়েন্দ্র ঘোষ সিবিলিয়ান। কল্যাণকুমারের বন্ধু। বিলেতে আলাপ, দেশে ফেরেন এক জাহাজে। কল্যাণকুমারের শেষের দিককার চিঠিপত্রে মাঝে-মাঝে আমরা এই বিনয়েন্দ্রের উল্লেখ পেয়েছিলুম। একবার একটা ছবিও এসেছিলো—দু'জন একসঙ্গে। ছোটোখাটো মানুষ, পাৎলা একটু গোঁফ, সরল মুখশ্রী—বিনয়েন্দ্র ঘোষ। হাসিখুশি সহজ স্বভাব—ছবি দেখে আমার তা-ই মনে হয়েছিলো। পরে যখন ভদ্রলোককে দেখলুম—কারণ কলকাতায় তিনি মাঝে-মাঝে আসতেন—সে-ধারণা বদলাতে হয়নি। তাঁকে দেখেছিলুম মনুষ্যচরিত্রের সেই বিরল একটা দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে কোনো অসাধারণত্বের অভাব পুষিয়ে নেয়া হয়েছিলো নিখুঁত সামঞ্জস্য দিয়ে। হৃদয়ের কি বুদ্ধির কোনো অসামান্য গুণ কি ব্যক্তিত্বের কোনো মোহময় আকর্ষণ না-নিয়েও সবারই প্রিয় হ'য়ে ওঠবার ক্ষমতা তাঁর ছিলো। বিনয়েন্দ্র ছিলেন অসাধারণরকম সাধারণ, ভালো অর্থে। মানে, তাঁর সাধারণত্ব এমন সম্পূর্ণ ছিলো যে এ-পৃথিবীতে সেটাই অসাধারণ।

মাত্র বাইশ বছর বয়স—মুখের ভাবটা তখনো নরম, কাঁচা। মৃদু রসিকতা করেন, মৃদু হাসেন। কল্যাণকুমার, বলতে গেলে, তাঁকে আস্ত গিলে ফেলতেন। আর বিনয়েন্দ্রের তাতেই যেন মজা।

কখনো বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করেন না, নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে একেবারেই তাঁর উৎসাহ নেই। উপস্থিত মুহূর্ত নিয়েই বড়ো বেশি ব্যাপৃত।

একদিন কল্যাণকুমার বললেন : 'অপর্ণা, বিনয় বলছিলো— তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয় হ'লো না। এ তোমার ভারি অন্যায়—কেন লুকিয়ে থাকো ?

'লুকিয়ে থাকি কোথায়।'

'তবে বিনয়ের সঙ্গে কেন তুমি আলাপ করো না ?'

'আমি কী-আলাপ করবো ওঁর সঙ্গে ?'

'প্রথমে বলবে, আজ কী গরম। বিনয় বলবে তার উত্তরে, কাল এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিলো। তুমি বলবে, এ-বছর বৃষ্টিটা যেন ভালো ক'রে হ'লোই না। তারপর—'

অপর্ণা-দি ব'লে উঠলেন, একটু হেসে : 'থামো।'

'আমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি আলাপ করবে না, তা কি হয় ? তাছাড়া, তুমি এত সুন্দর—তোমাকে বিয়ে করতে পারেনি ব'লে তোমাকে কি দেখতেও পাবে না অন্যেরা ?'

'কী যা-তা বলো।'

'তুমি এত সুন্দর, অপর্ণা, তুমি এত সুন্দর! তোমার রূপ কি লুকিয়ে রাখবার ? দেখতে দাও, সকলকে দেখতে দাও!'

'কী বাজে—!'

'কিন্তু কথাটা সত্যি, অপর্ণা'! ব'লে কল্যাণকুমার উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

কল্যাণকুমার ছাড়লেন না, বন্ধুকে ইনট্রোডিউস ক'রে দিলেন স্ত্রীর সঙ্গে। আমি উপস্থিত ছিলুম সেখানে। নিচের তলায়, কল্যাণকুমারের 'ড্রয়িংরুমে'। ঘরটা নিতান্তই সাজানো-গুছানো, নিতান্তই বিজ্ঞাপন। অব্যবহৃত ও অব্যবহার্য। একটা সোফার কোণ ঘেঁষে অপর্ণা-দি বসলেন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সমস্ত মুখ হাসিতে উজ্জ্বল করে, সেই গলে শিভলরির সুরে বিনয়েন্দ্র বলতে লাগলেন :

'মিসেস চৌধুরী, আপনার সঙ্গে পরিচয় ক'রে ধন্য হলুম। মুখোমুখি এই আপনাকে প্রথম দেখছি, কিন্তু আভাসে ঝলকে আপনাকে দেখেছি আগেও, আপনি অবশ্য তা জানেন না। কল্যাণটা এমন স্বার্থপর—বন্ধুদের কাছে দিব্যি সুবিধেমতো ভুলে' থাকে যে ওর একজন স্ত্রী আছে। অন্যায় না ?'

অপর্ণা-দি হেসে বললেন, 'আপনি তো আসেন প্রায়ই।'

'সেই তো দুঃখ, সেই তো আরো বেশি দুঃখ। প্রায়ই আসি, কিন্তু আপনার দর্শন এত বিরল।'

'দুঃখটা বিশ্বাস করা শক্ত', অপর্ণা-দি হাসলেন, 'মাঝে-মাঝে এমন হাসির রোল কানে এসে পৌঁছয়।'

'সে-ও আপনার স্বামীর। অমন প্রাণ-খোলা হাসি কি আমি হাসতে পারি।'

এর পর সাধারণরকম আলাপ চললো—কোথায় থাকেন এখানে, চাকরি কেমন লাগছে, মফস্বলে থাকবার সুবিধে আর অসুবিধে—এই সব। ওএদেরেরই কাছাকাছি। তারপর অপর্ণা-দি

বললেন : 'অনেক মিষ্টি-মিষ্টি কথা শোনালেন—এইবার একটু মিষ্টিমুখ করুন।'

ব'লে উঠে গেলেন জলযোগের আয়োজনে।

কল্যাণকুমার এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। বোধহয় পরীক্ষা করছিলেন—আমার, অন্তত, তা-ই মনে হয়েছিলো—অপর্ণা স্বাধীনভাবে অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে আলাপ করতে পারে কিনা। পরীক্ষায় অপর্ণা-দি ভালোই উৎরেছিলেন। কল্যাণকুমার একবার দেখছিলেন বন্ধুকে, একবার স্ত্রীকে—আর বাঁকা ঠোঁটে মিটিমিটি হাসছিলেন। আমোদের হাসি, কিন্তু শুধু আমোদের? কী জানি, আমার যেন ভালো লাগেনি।

বিনয়েন্দ্র চ'লে যাবার পর সিগারেট ধরাতে-ধরাতে কল্যাণকুমার হঠাৎ বললেন :

'How did you like my friend?'

'বেশ তো।'

'বেশ, না? বেশ।' হঠাৎ একটা অদ্ভুত হাসি কল্যাণকুমারের মুখের উপর রেখা এঁকে দিয়ে গেলো।—'He has a pretty face, eh?'

'হ্যাঁ, বেশ মিষ্টি চেহারা।'

'মিষ্টি!' কল্যাণকুমার মাত্রা ছাড়িয়ে হেসে উঠলেন এবার, 'মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি কথা, মিষ্টি মুখ। একটু মিষ্টিমুখ না-করালে কি চলে!'

অর্পণা-দি প্রশ্নভরা চোখ তুললেন : 'কী বলছো?'

যেমন হঠাৎ অসংগতরকম হেসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ অসংগত-রকম গম্ভীর হ'য়ে গেলেন কল্যাণকুমার। সিগারেটে টান দিয়ে বললেন: 'সত্যি, ভারি ভালো ছেলে বিনয়। I like him. I like him very much. He is my friend. I like him.' যেন অন্য-কোনো কথা ভাবতে-ভাবতে অকারণে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন।

অপর্ণা-দি বললেন, 'ওঠো, বেলা হ'লো। স্নান করবে না?'

'বিনয়কে আরো ঘন-ঘন আসতে বলবো। ওকে তোমার আরো বেশি ভালো লাগবে, দেখো।' আর, একটু পরে, অসংলগ্নভাবে কল্যাণকুমার বললেন, 'মিষ্টি ও খুব ভালোবাসে।'

বিনয়েন্দ্রের আনাগোনা চলতে লাগলো। কখনো এসে মায়াকে বলেন কোকো বানিয়ে দিতে, তার সঙ্গে দীর্ঘ সূক্ষ্ম আলাপ করেন বেশভূষার হালফ্যাশন নিয়ে। সে-আলাপ অত্যন্তই পারিভাষিক, আমার সাধ্য ছিলো না তাতে যোগ দিতে পারি। মেয়েদের কাপড়-চোপড় বিনয়েন্দ্র বুঝতেন। তার মাত্রা, মাপ, রং, ছন্দ—এ-সব বিষয়ে আশ্চর্য পরিষ্কার তাঁর ধারণা, এমনকি, উদ্ভাবনীশক্তিও ছিলো একটু। আর মায়া শুনতো মুগ্ধ হ'য়ে। যদিও কার্যত হ'য়ে উঠতো না সব সময়, এ-বিষয়ে থিওরিগত উৎসাহের অভাব ছিলো না তার।

কখনো বা আমাকে একা পেলে কিংবা আর কাউকে না-পেলে, বিনয়েন্দ্র আমার সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দিতেন—প্যারিসের কাফের গল্প, বাথ, ভিয়েনা, ভিনিস। তাঁর বর্ণনায় গভীরতা

ছিলো না। অনেক-কিছুই চোখ দিয়ে দেখেছেন, মন দিয়ে কিছুই ছাখেননি। তবু ভালো লাগতো আমার। কল্যাণকুমারের চাইতে অনেক বেশি গলিঘুঁজি ঘুরেছিলেন তিনি, আর তাঁর ভাসা-ভাসা বর্ণনার ফাঁকগুলি আমি আমার কল্পনা দিয়ে ভ'রে নিতে পারতুম।

চমৎকার মানুষ বিনয়েন্দ্র। সেই ধরনের, যারা তরতর ক'রে ব'য়ে চ'লে যায় জীবনের উপর দিয়ে, যাদের মনে ভাবনার বাধা রচনা করে না কখনো। সুখী হওয়া তাদের নিয়তি। কল্পনার অভিশাপ নেই তাদের উপর। আমার বিশ্বাস, বিনয়েন্দ্র এখনো, বেঁচে থাকার ভার এতদিন ধ'রে বহন করবার পরেও, এখনো সুখী, সেই বাইশ বছর বয়সে যেমন ছিলেন। কেননা জীবনের ভার অনুভব করবারই যে তাঁর জন্মগত অক্ষমতা। ভোলা যায় না এমন মানুষ তিনি নন, কিন্তু তাঁর কথা মনে হ'লে এখনো ভালো লাগে আমার। ভেবে দেখছি, তাঁর মতো লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে আরো বেশি হ'লে পৃথিবীটা বসবাসের আরো একটু যোগ্য হ'তো। বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখা নেই। কিন্তু খবর কানে আসে, বাকিটা অনুমান করতে পারি। রিটায়ার ক'রে আছেন কালিম্পং-এ বাড়ি ক'রে। (চাকরির সময় যেমনি প্রতাপ, চাকরি খতম হ'লে তেমনি কেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় আই. সি. এস্‌রা, কেউ কি জানে?) মাথায় টাক, বপু বেড়েছে আয়তনে, বাগান করেন, রেডিও শোনেন, আর পড়েন এমন বই, যা ইংরেজ ভদ্রলোক পড়ে; যাতে খুনে ধরা পড়ে শেষ পাতায়,

কি শেষ পাতায় শাঁখ বাজে, আর যাতে আগাগোড়াই ধ'রে নৈয়া হয় যে বিবাহ আর সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী আর-কোনো প্রক্রিয়া নেই। সুখে আছেন তিনি, সুখে থাকুন।

বিনয়েন্দ্রের সঙ্গে আর-একজনকে কি মনে পড়ে না? কিন্তু সে তো নয়; যাকে আমি জানতাম সে তো নয়। সে নেই, কোনোখানে নেই—এক আমার মনের মধ্যে ছাড়া। আমার মনে, আমার স্বপ্নে। আমার আকাশে, আমার রাত্রিতে, আমার ব্যথায়, আমার কবিতায়।

এক বিকেলে আড্ডা জমেছে নিচের ঘরে। কল্যাণকুমার আর বিনয়েন্দ্র। অপর্ণা-দি এলেন। পরনে শান্তিপুরি শাড়ি, মুখে-চোখে বৈকালিক স্নানশেষের প্রসাদ। কিছুক্ষণের জন্যও সে-সভায় তিনি উপস্থিত থাকেন এটা তিনি জানেন স্বামীর ইচ্ছা ব'লেই, নয় তো নিজের ইচ্ছার উপরেই যদি তাঁকে ছেড়ে দেয়া হ'তো, তবে তিনি সে-সময়টা কাটাতেন ঘরকন্নার কাজে, কিংবা মা-র সঙ্গে, মায়ার সঙ্গে গল্প ক'রে। কিন্তু নিজের কোনো ইচ্ছাকে আমলের মধ্যেই আনতেন না অপর্ণা-দি। স্বামীই তাঁর জীবনের কেন্দ্র।

বিনয়েন্দ্র তাঁকে দেখে, তাঁর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে ব'লে উঠলেন: 'ও, আপনি।'

'আপনাদের আলাপে বাধা দিলুম বুঝি?'

'না, তা নয়। আমি যে চমকে উঠেছিলুম তা অন্য কারণে। শুনলে হাসবেন।'

'বেশ তো, হাসির কথাটাই শোনা যাক।'

'সত্যি বলতে', চাপা হাসিতে বিনয়েন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হ'লো, 'আমার মনে হ'লো যেন হঠাৎ কোনো দেবী এলেন ঘরে।'

কথাটা শুনে কল্যাণকুমার স্ত্রীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলেন তাঁকে। 'Ah, really! বলতে-বলতে তাঁর ঠোঁট উপরের দিকে একটু বেঁকে গেলো, 'Really! সত্যি, অপর্ণা—it's simply absurd to be so beautiful.'

লজ্জিত, আরক্ত অপর্ণা-দি কোনদিকে তাকাবেন ভেবে পেলেন না।

'I say, বিনয়', হালকা ফুর্তির ধরনে কল্যাণকুমার বললেন, 'I say, you ought to have been a poet. So you took her for a goddess!' বলতে-বলতে হাঁটু চাপড়ে হেসে উঠলেন।

হাসিটা একটু বেখাপ্পা। কিন্তু কারো মনেই কিছু লাগলো না, কল্যাণকুমারের ধরনই ঐ। বিনয়েন্দ্র বললেন, 'আরো অনেক ভালো-ভালো কথা আমার বলবার ছিলো, কিন্তু সন্দেহ করেছি কল্যাণ ঠাট্টা করছে।'

'তা ছাড়া', অপর্ণা-দি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, যেখানে-সেখানে সব ব'লে ফেলবেন না, যথাস্থানের জন্য হাতে রাখবেন কিছু।'

'আমি কি অযথাস্থানে বলেছি নাকি?'

'সেটাও কি আমাকে ব'লে দিতে হবে?'

'আমার বাচালতায় যদি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে দয়া ক'রে আমার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন।'

অপর্ণা-দি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'সে-ব্যবস্থা হচ্ছে। মায়াকে ব'লে এসেছি।'

কল্যাণকুমার হঠাৎ ব'লে উঠলেন: 'আহ্! তুমি তো আবার মিষ্টি ভালোবাসো, বিনয়।'

'তা নিয়েই তো তোমার সঙ্গে আমার চিরন্তন ফিয়ুড।'

কল্যাণকুমার অপর্ণা-দির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন: 'তুমি মিষ্টি ভালোবাসবে না—এমন মিষ্টি মুখ তোমার। মিষ্টি, মিষ্টি। Sweet. Sweet unto sweet. অপর্ণার মুখখানাও মন্দ মিষ্টি না—কী বলো?' কল্যাণকুমারের মুখে হাসির রেখাগুলি ফুটে উঠতে-উঠতে হঠাৎ মিলিয়ে গেলো। গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে তিনি পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন।

খানিক পরে মায়া এলো চা ইত্যাদি নিয়ে। বিনয়েন্দ্রের মুখ চলতে লাগলো—আহার এবং আলাপ দুই অর্থেই। তাঁর মুখ বন্ধ করতে পারে এমন ক্ষমতা সামান্য পার্থিব আহার্যের ছিলো না।

পাইপটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধ'রে কল্যাণকুমার ব'লে উঠলেন: 'ওঃ-হো! মায়া, উপর থেকে দেশলাই নিয়ে আয় তো একটা। আমার টেবিলের দেরাজে আছে।'

মায়া উঠে গেলো। 'তুমি তো কিছুই খাচ্ছো না,' বিনয়েন্দ্র মন্তব্য করলেন।

'তোমার খাওয়া দেখছি।'

'তা দেখতে পারো। কে যে কিসে সুখ পায়, কিছুই বলা যায় না।'

হঠাৎ কল্যাণকুমার উঠে দাঁড়ালেন।—'একটু বোসো তোমরা—আমি এক্ষুনি আসছি।'

'কোথায়— ?'

'দেশলাইটা আছে অন্য জায়গায়। মায়া খুঁজে পাবে না,' বলতে-বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে, চায়ের বাটিতে একটু-একটু চুমুক দিতে-দিতে বিনয়েন্দ্র বলছিলেন : 'আ, মিসেস চৌধুরী, আপনি যদিও দেবীর মতো দেখতে, তবু আচরণে ব্যবহারে যে নিছক মানুষেরই মতো, এ-জন্য ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ না-জানিয়ে পারছি না।'

'স্বর্গ-মর্ত্য দুটোর উপরেই আপনার সমান লোভ দেখছি,' বললেন অপর্ণা-দি।

বিনয়েন্দ্র কী-একটা হাস্যরসাত্মক জবাব দিতে যাচ্ছেন, হাসিতে তাঁর মুখের পেশীগুলো আগে থেকেই স্ফীত হ'তে আরম্ভ করেছে, এমন সময় ঘরের দরজার কাছে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো : 'Excuse me.'

দু' জনে একসঙ্গে চোখ তুললেন। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে

কল্যাণকুমার এক হাতে পরদা ধ'রে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন ঘরের মধ্যে, ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণভাবে, ইঙ্গিতময়ভাবে হাসছেন। এগিয়ে এসে অন্য দু' জনের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। কন্টিনেণ্টাল কায়দায় বাউ ক'রে নিখুঁত অক্সফোর্ডি উচ্চারণে বললেন : 'Excuse me. I hope I am not intruding.'

বিনয়েন্দ্র তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হে? নাটকের রিহার্সেল দিচ্ছো নাকি? বোসো, চা তো ঠাণ্ডা হ'লো তোমার।'

ক্ষীণ হাসি তবু লেগেই রইলো কল্যাণকুমারের ঠোঁটে। একটা চেয়ারে ব'সে চুমুক দিলেন চায়ে। তারপর বললেন, 'বিনয়, তুমি অপর্ণাকে নাচ শেখাবে?'

'নাচ?'

'হ্যাঁ, নাচ। ডান্স। তুমি না খুব ভালো নাচতে পারো?'

'কোনো-একটা কাজ খুব ভালো ক'রে করতে না-পারলে মানুষের আত্মসম্মান থাকে কী ক'রে?' তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে, দুষ্টু, চাপা হাসিতে উজ্জ্বল মুখে :

'উনি কি নাচ শিখবেন—সত্যি?'

অপর্ণা-দি হাসলেন। 'আপনিও যেমন! ও তো কতই বলে।'

ঘরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে শিষ দিয়ে উঠলেন কল্যাণকুমার।—'কেন, দোষ কী?'

'সে-কথা ওঁকেই জিগেস করো।'

'কী-সব বাজে—!' অপর্ণা-দি আঁচল টানলেন গায়ে।

সেই রাত্রে খাওয়ার পরে বারান্দার ইজি-চেয়ারে কল্যাণকুমার অনেকক্ষণ ব'সে ছিলেন একা। অপর্ণা-দি এসে বললেন, 'শোবে না ?'

কল্যাণকুমার কোনো জবাব দিলেন না।

'রাত হ'লো', অপর্ণা-দি আবার বললেন।

'হ'লোই বা। তুমি ঘুমোও।'

'তুমি ?'

'না-হয় ব'সেই থাকলুম। তুমিও বোসো না—একটু গল্প করি।'

'ঘুম পাচ্ছে না তোমার ?'

'না, ঘুম পাচ্ছে না। কথা বলতে ইচ্ছে করছে। গল্প করতে। বিনয় বেশ মজার গল্প করতে পারে।'

অপর্ণা-দি বললেন, 'এ-রকম হয় মাঝে-মাঝে।'

কল্যাণকুমার হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন।—'কী হয় ?'

'ঘুম পায় না কিছুতেই। তুমি বরং শুয়ে-শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করো। কথা বললে আরো মাথা গরম হবে।'

কল্যাণকুমার সংক্ষিপ্ত, নিম্ন এক হাসি নির্গত করলেন।

'হাসছো যে ?'

'বিনয়ের একটা কথা মনে ক'রে। ওর কথা শুনে এমন হাসি পায়।'

'এমন কী-কথা যা মনে ক'রে এখন তোমার হাসি পেলো ?'

'তোমার পায় না ? তখন তো হাসছিলে।'

'কখন ?'

'তখন—বিকেলে। মনে নেই ? তোমরা দু' জনে একসঙ্গে হাসছিলে। তুমি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ওকে কিছু বলছিলে।'

'কী বলছিলুম ?'

'সেটাই তো জানতে চাই', কল্যাণকুমার সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন, 'সেটাই তো জানতে চাই। কী বলছিলে ?'

অপর্ণা-দি প্রশ্নময় দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন।—'কী বলছো ? কিসের কথা বলছো ?'

'ভুলে গেলে ? এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?' কল্যাণকুমারের শরীরের ভঙ্গিটা ক্রমেই কঠিন হ'য়ে উঠলো, 'অথচ তখন তো হাসছিলে। কেন হাসছিলে মনে করতে পারো না ?'

অপর্ণা-দির চোখে একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক ফুটে উঠলো। বললেন, 'কী ? বলছো কী ?'

'বলো !' কল্যাণকুমারের মুখে হঠাৎ একটা অশুভ ছায়া পড়লো, 'বলো, কী বলছিলে। বলতেই হবে তোমাকে।' অপর্ণা-দির একটা হাত খপ ক'রে ধ'রে ফেললেন, আর তার উপর জোরে চাপ দিতে-দিতে : 'বলো, বলো !'

অপর্ণা-দি হাত ছাড়িয়ে নেবার, কি কিছু করবার, কোনো-রকম চেষ্টাই করলেন না। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ একেবারে ম্লান হ'য়ে গেলো, ভোরবেলার মোমবাতির মতো ম্লান।

আর হঠাৎ, কল্যাণকুমার হাত ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে হেসে উঠলেন। চুলের ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন একটু। দু'আঙুলে মাথার দু দিক টিপে ধরলেন। তারপর :

'চলো শুই। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঘুম পাবে।'

অপর্ণা-দি কিছু বললেন না, শরীরের ক্ষীণতম কোনো ভঙ্গি করলেন না। কল্যাণকুমার উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন : 'পাগল! ঠাট্টা ক'রে একটা কথা বলি— তা-ও বোঝো না।'

অপর্ণা-দি চোখ তুলে চাইলেন ; সেখানে, হ্রদের শান্ত-নীল জলে আলোর মতো টলমল করছে বিশ্বাস। তবু চোখের কোণে-কোণে অভিমানের ছায়া রয়েছে লেগে। 'তোমার হয়েছে কী ?' জিগেস করলেন, 'তোমার শরীর কি ভালো নেই ?'

'শরীর ? শরীর ভালোই আছে। তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। চলো ঘুমুই।'

আর কথা বললেন না অপর্ণা-দি। একটা নিরবয়ব নামহীন আশঙ্কা লাগলো তাঁর রক্তে। যেন কোনো অশুভ অন্ধকার জগৎ থেকে একটা অদৃশ্য প্রেত-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দিকে। কিছু না, মনে-মনে তিনি বললেন, কিছু না। বার-বার বললেন। স্বামীকে লক্ষ্য করলেন অত্যন্ত কাছে থেকে। লক্ষ্য করবার কী আছে ? কিন্তু আজ রাত্রে তাঁর হাব-ভাব, কথাবার্তা কি একটু অদ্ভুত, একটু অস্বাভাবিক নয় ? না, না :

অপর্ণা-দি চেষ্টা করলেন মন্ত্র-উচ্চারণে সেই অশুভ ছায়াকে কিছু-না ক'রে দিতে। কিন্তু সে-রাত্রে ভালো ঘুম হ'লো না; অনির্ণেয় প্রেত-হাত তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ঘুমের মধ্যে, তাঁর স্বপ্নের মধ্যে।

কয়েকদিন পর, বিনয়েন্দ্র যখন নিচে থেকে খবর পাঠালেন, 'তুমি যাও না, অপর্ণা,' কল্যাণকুমার বললেন, 'বিনয়ের কাছে একটু বোসো গে।'

কথাটা অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত সহজ ভাবে বলা। কিন্তু অপর্ণা-দির বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা তীর চ'লে গেলো। নিজেকে তিনি ঠাট্টা করলেন, মনকে তিনি ধমকালেন। তাঁকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে—

'যাও,' কল্যাণকুমার আবার বললেন, 'ওকে গিয়ে বলো আমার একটু দেরি হবে। একটা চিঠি লিখছি, দেখছো না?'

'চিঠি না-হয় পরে শেষ কোরো। ওঁকে বসিয়ে রাখা কি ভালো দেখায়?'

'বাঃ, তুমিই তো আছো।' তারপর, তবু অপর্ণা-দিকে ইতস্তত করতে দেখে: 'যাও না! সাধারণ একটু ভদ্রতাও যদি করতে না পারো, তুমি আছো কী করতে?'

তিরস্কৃত, অপর্ণা-দি দরজার দিকে যেতে লাগলেন। হঠাৎ কল্যাণকুমার পিছন থেকে তাঁর আঁচল ধ'রে ফেললেন খপ ক'রে। অপর্ণা-দি চমকে ফিরে তাকাতেই হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন: 'ধ'রে ফেলেছি!'

একটা অকথ্য আতঙ্ক ফুটে উঠলো অপর্ণা-দির চোখে, শাদা হ'য়ে গেলো মুখ। রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কী বলছো ?'

'ধ'রে ফেলেছি, ধ'রে ফেলেছি !' বিকট উল্লসিত স্বর কল্যাণকুমারের।

পাথর হ'য়ে গেলো অপর্ণা-দির শরীর। মুখের উপর তিনি অনুভব করলেন স্বামীর ক্রূর, বক্র দৃষ্টি। 'White', স্ত্রীর মুখের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি, কল্যাণকুমার ব'লে উঠলেন, 'Red and white. You pretty paintface !'

অপর্ণা-দির ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো, বিস্ফারিত হ'লো চোখ। তাঁর হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরেছে সেই অদৃশ্য প্রেত-হাত।

'A goddess, a goddess !' তারপর হঠাৎ, অপর্ণা-দির আঁচল ছেড়ে দিয়ে কল্যাণকুমার হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লেন মেঝের উপর, দু'হাতে তাঁর জানু জড়িয়ে ব'লে উঠলেন :

'Have pity on me. Have pity on me.'

৫

মেঘ ঘনিয়ে এলো দিগন্তে। কল্যাণকুমারের দেশে ফেরবার পর ছ'মাস কেটেছে। অক্সফোর্ডের একটা ডিগ্রি [illegible]র পর এত সময় লাগে না বিশ্রাম করতে। কিন্তু এর মধ্যে তিনি একবার শুধু গিয়েছিলেন তাঁর দেশের বাড়িতে, দু'দিনের জন্য। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গেই আছেন। আছেন তাঁর অপর্ণার পরিমণ্ডলে। কিছু করবার চেষ্টাই নেই। তাঁর সব ভালো-ভালো সংকল্প—যুব-চিত্তের বোধনা, স্বদেশের মুক্তি, ম্যাথু আরনল্ডীয় আলো আর মধুরতার বিস্তার—সব মিশে গিয়েছিলো এক হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে, তাঁর অপর্ণার মধ্যে। তাঁর যেন আর-কিছুই করবার নেই, শুধু ব'সে-ব'সে পাইপ টানা, আর তাকিয়ে থাকা অপর্ণার মুখের দিকে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা হোক তা সবাই কামনা করে, কিন্তু স্বামীর অনুগত্য যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন মেয়েরাই আপত্তি করে সবার আগে। মা বললেন, 'কল্যাণ, এবার কিছু কর। সময় নষ্ট করছিস কেন ব'সে-ব'সে ?'

'কী করি বলো তো ? আর সময় ? তুমি যা-ই করো আর না করো সময় নষ্ট হবেই। তাকে কি ধ'রে রাখতে পারো ?'

'এতগুলি ভালো-ভালো চাকরি নিয়ে সাধাসাধি করলো—একটা নিলেই তো হ'তো।'

কল্যাণকুমার গম্ভীরভাবে পাইপ টানতে লাগলেন—কিছু বললেন না।

এই সময়ে দিনের বেশির ভাগ সময় তাঁকে দেখা যেতো—বারান্দায় ইজি-চেয়ারে চুপচাপ ব'সে, পাইপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, এক ভল্যুম কার্লাইল কি গিবন হাতে। কখনো তিনি পড়ছেন, কখনো ইংরেজি গান করছেন গুনগুন ক'রে, বিলিতি নাচের সুর শিষ দিচ্ছেন কখনো বা। ইংরেজিতে ছাড়া প্রায় কথাই বলেন না। ধুতির উপর প'রে থাকেন তাঁর সেণ্ট জন্স কলেজের কোট-অব-আর্মস-চিহ্নিত নীল কোর্তা। যত গরমই হোক, সেটি ছাড়েন না কখনো। সেই নীল কোর্তা—একটা প্রতীক, একটা অনুষ্ঠান। তা নিয়ে বেশ একটু গর্ব ছিলো তাঁর মনে।

এক সেই কোর্তাটি ছাড়া আর যে-কোনো বিষয়ে তাঁর ব্যবহারে অদ্ভুত শৈথিল্য দেখা যেতে লাগলো। ধুতি সাফ না-থাকলে গ্রাহ্য করেন না, দাড়ি বাড়তে দেন দু-দিন, নিয়ম রাখেন না স্নানাহারের। এগারোটা বাজে, বাজে বারোটা—তিনি ব'সেই আছেন চেয়ারে, পাতা ওল্টাচ্ছেন বইয়ের, কোলের উপর বই মেলে তাকিয়ে আছেন সামনের যে-কোনো কিছুর দিকে। মা তাড়া দিয়ে-দিয়ে হয়রান। কল্যাণকুমার গম্ভীরভাবে বলেন,

'চুপ করো, এখান থেকে যাও। ভাবতে দাও আমাকে।'

'এত কী ভাবনা রে তোর ?'

'আছে ভাবনা।' কল্যাণকুমার দু' আঙুলে মাথার দু' দিক শক্ত ক'রে চেপে ধরেন : 'অনেক ভাবনা।'

মা সে-কথা বিশেষ গায়ে না-মেখে বলেন, 'স্নান ক'রে খেয়ে নিলে দোষ কী ? ভাবনার সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

মাথা নিচু ক'রে কল্যাণকুমার একটু চুপ ক'রে থাকেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম, ছোটো সাপের মতো যে-হাসি ফুটে উঠেছে, মা তা লক্ষ্যও করেন না। তাড়া দেন আর-একবার। কল্যাণকুমার মুখ তুলে শান্তভাবে বলেন : 'নিয়ে এসো— এখানে ব'সেই খাচ্ছি।'

'সে কী ? স্নান না-ক'রেই—'

'না, না, স্নান করবো না। ভালো লাগে না স্নান করতে।'

একটু সময়, মা চুপ ক'রে তাঁর ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অমন-যে আসুরিক স্বাস্থ্য, তারও, কোথায় যেন চিড় ধরেছে। যে-মুখে সব সময় উৎসাহ জ্বলতো শিখার মতো, এ কী তার পাংশু রং। যেন কোনো গোপন অশুভ শক্তিতে তাঁর জীবনের ভিৎ ভিতরে-ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে।

মা জিগেস করেন, 'তোর হয়েছে কী ? দাড়ি কামাবারও সময় হয় না ? এ কী চেহারা করেছিস !'

'বেশ আছি। বেশ ভালোই আছি।'

'দেখে তো তা মনে হয় না। কী ভাবিস এত দিন-রাত ব'সে-ব'সে বল তো।'

'এ ছাড়া কি কথা নেই তোমার ?' কল্যাণকুমার হঠাৎ চ'টে ওঠেন, 'পড়াশুনা করছি দেখতে পাও না ? কেন বিরক্ত করো ?'

এমনি ঘটতে লাগলো প্রায়ই। সাধারণ দিন-যাপনের

কোনো নিয়মই তিনি আর মানেন না; বেশি কথা বলেন না কারো সঙ্গে—অপর্ণা-দির সঙ্গেও না। শিগগিরই এমন সময় এলো যখন এ-সব জিনিশ অত্যধিক কোণওলা মানুষের স্বাভাবিক উৎ-কেন্দ্রিকতা ব'লে আর আর উড়িয়ে দেয়া যায় না। মা-র মুখ শুকিয়ে গেলো। কোথাও কিছু-একটা গোলমাল হচ্ছে, বাবার কানে পৌঁছলো এ-খবর। তিনি এসে বললেন, 'কল্যাণ, তোমার শরীর এখানে ভালো থাকছে না, দারজিলিঙে ঘুরে এসো না কিছুদিন।'

কল্যাণকুমার বললেন বাঁকা হেসে, 'I don't think Darjeeling has any charm for me.'

'কিন্তু তোমার শরীর ভালো হবে। অপর্ণাকেও নিয়ে যাও।'

'Why do you say that?'

বাবা ঠিক বুঝতে না-পেরে বললেন, 'কী?'

'She can stay here, can't she? I am not the sort of man to drag her along with me always. Oh no—I can leave her alone. I can!' শেষের কথাগুলিতে তীব্র হ'য়ে বাজলো কল্যাণকুমারের স্বর, যেন কোনো বিপক্ষের কথা খণ্ডন করছেন।

সে-সব কথা বিশেষ গ্রাহ্য না-ক'রে বাবা বললেন, 'না-হয় অন্য কোথাও যাও—যেখানে তোমার ভালো লাগে।'

'I am all right here',

বাবা আরো কিছু যুক্তি প্রয়োগ করবার চেষ্টা করলেন, কোনো ফল হ'লো না। কল্যাণকুমারের ঐ এক কথা: 'I am all right here'.

মেঘ ছড়াতে লাগলো। সমস্ত বাড়িটা থমথমে। যাকে কেন্দ্র ক'রে গেলো কয়েক বছর ধ'রে আমাদের পরিবারের আশা আর ভালোবাসা, সুখ আর কল্পনা গ'ড়ে উঠছিলো, তার আত্ম-বিভেদের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের জীবনেও একটা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। সবই কেমন ছাড়া-ছাড়া, মূলহীন, মূল্যহীন। কল্যাণকুমার আমাদের জীবনে নিয়ে এসেছিলেন অনেক ভালোবাসার টানা-পোড়েন; সেগুলি ছিঁড়লেন নিজেরই হাতে, কুচি-কুচি ক'রে।

এক রাত্রে হঠাৎ অপর্ণা-দির ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মেলে তিনি দেখলেন, ঘরে আলো জ্বলছে, আর কল্যাণকুমার তাঁর মুখের উপর ঝুঁকে তাকিয়ে অছেন। সে-দৃষ্টি এমনই গভীর, এমনই নির্নিমেষ, এমনই তীব্র যে অপর্ণা-দি ভয়ে জ'মে গেলেন। কষ্টে তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো: 'কী?'

'তোমাকে দেখছি।'

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে একটু আশ্বস্ত, অপর্ণা-দি বললেন, 'তুমি ঘুমোওনি?'

'কী সুন্দর! কী সুন্দর তুমি দেখতে।'

'ঘুমোও। আলোটা নিবিয়ে দাও।'

'না, থাক। তোমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও।'

সে-স্বরে বুঝি কিছু ছিলো, অপর্ণা-দি উঠে বসলেন। কল্যাণকুমারের কপালের উপর ছোটো-ছোটো নীল শিরা হঠাৎ ফুলে উঠলো। স্ত্রীর হাত ধ'রে ফেলে তিনি বললেন, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'কোথাও না—' বলতে অপর্ণা-দির গলা কেঁপে গেলো।

'না—বলো।' কল্যাণকুমার স্ত্রীর হাতে একটা মোচড় দিলেন।

কষ্টে, অপর্ণা-দির মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা চীৎকার বেরুলো। সঙ্গে-সঙ্গে কল্যাণকুমার হাত ছেড়ে দিলেন। 'থাক', মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'এখন থাক। এখন ঘুমোনোই ভালো। কিন্তু তুমি কি কখনো. বলবে? অপর্ণা, কখনো কি বলবে?' কল্যাণকুমারের চোখে বিশ্বের সমস্ত তৃষ্ণা ফুটে উঠলো। 'তোমার মনের কথা, তোমার মনের কথা।' তাঁর স্বর আস্তে-আস্তে চড়তে লাগলো, 'বলো, বলো তোমার মনে কী আছে। তোমার শরীর সুন্দর, তা আমি দেখতে পাই। কিন্তু তোমার মন! তোমার শরীর সুন্দর, তাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তোমার মন—তোমার মন কেন দেখতে পাই না? তোমার মন কেন দেখতে পাই না?' বলতে-বলতে কল্যাণকুমার আঙুলের গাঁট ঠুকতে লাগলেন নিজের মাথার দু' দিকে।

এ-সব ব্যাপার, যা এখানে লিখলুম, তার খানিকটা দেখেছি, বাকিটা অনুমান ক'রে নেয়া কঠিন নয়। আর, কিছু শুনতে হয়েছিলো অপর্ণা-দিরই মুখ থেকে, যখন কিছুই আর গোপন

করবার রইলো না। ছাড়া-ছাড়া টুকরোগুলি জোড়া দিয়ে গল্প সাজাতে চাই না—কোনো দরকার নেই তার। মনে করতে চাই না সেই সময়কার খুঁটিনাটি ঘটনা। চাইলেও যে পারি, তা নয়। আমার স্মৃতির ছবিতে এই সময়কার রংই সবচেয়ে ফিকে। মন জমিয়ে রাখে ভালোবাসার তুচ্ছতম ভগ্নাংশ; যেখানে সে আঘাত পায়, সেখানে সে হারিয়ে ফেলে। মানুষের আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তির এটাও একটা লীলা।

আর চাপা দিয়ে রাখা গেলো না, ফুটে উঠতে লাগলো স্পষ্ট হ'য়ে, রূঢ় নিষ্ঠুর হ'য়ে। প্রায় রোজই ঘটছে কিছু-না-কিছু, সত্যকে যা প্রকাশ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে আরো নগ্ন ক'রে। সে-সব দিনের কথা ভাবতে এখনো আমার কষ্ট হয়। তখনকার সেই শোক আর আতঙ্ক, দুঃখ আর প্রার্থনা, তখনকার সেই কান্না আর অনুশোচনা আর বিলাপ—কী লাভ সে-সব ব'লে।

তবু নগ্ন সত্যকে মুখোমুখি দেখতে আমাদের সময় নিলো। মানুষের স্বভাব দুর্বল। আশা নেই বুঝেও আমরা আশা করি। মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরি প্রাণপণে—যতদিন পারা যায়। যতদিন না বজ্র ভেঙে পড়ে।

মাঝে মাসখানেক বিনয়েন্দ্র আসেননি, হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত। প্রথম তাঁর দেখা মায়ার সঙ্গে। মায়া বললো, 'দাদার শরীর খারাপ।'

'শরীর খারাপ? কী হয়েছে?'

মায়া চুপ ক'রে রইলো।

'খুব অসুখ ? নিচে নামতে পারে না ?'

'আপনি বরং উপরেই আসুন।'

মায়া বিনয়েন্দ্রকে নিয়ে উপরের বারান্দায় এলো, যেখানে তাঁর সেই অনড় ইজি-চেয়ারে কল্যাণকুমার ব'সে। তাঁকে দেখে বিনয়েন্দ্র ভয়ংকররকম চমকে উঠলেন। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর উপর চোখ পড়ামাত্র কল্যাণকুমার চেয়ারে খাড়া হ'য়ে ব'সে, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন :

'তুমি কেন এসেছো ? তুমি কী চাও ?'

বিনয়েন্দ্র স্তম্ভিত হ'য়ে একবার বন্ধুর দিকে, একবার মায়ার দিকে তাকালেন। মায়া মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'Ah, you are here again !' কল্যাণকুমারের ইংরিজি ছুটলো, 'What do you want ? What do you want here ?'

বিনয়েন্দ্র সাহস সঞ্চয় ক'রে দু' পা এগিয়ে গেলেন। ডাকলেন, 'কল্যাণ।'

মুহূর্তের মধ্যে কল্যাণকুমারের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেলো। শিথিল হ'য়ে এলো তাঁর শরীরের ভঙ্গি, দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো অসহায় কারুণ্য। অত্যন্ত নরম, প্রায় ভীতস্বরে তিনি সাড়া দিলেন, 'বিনয়।'

বিনয়েন্দ্র তাঁর কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। 'I am sorry,' কল্যাণকুমার বলতে লাগলেন। 'You don't mind, do you ? Say you don't. Say you don't

hate me. Can't you love me—a little? I'm so much in need of love. If you knew—if you knew how unhappy I am!'

বড়ো-বড়ো অবিন্যস্ত চুলের ভিতর আঙুলগুলি চালিয়ে দিয়ে কল্যাণকুমার গভীরভাবে মাথা নিচু করলেন। তাঁর থুৎনি প্রায় বুকের সঙ্গে এসে ঠেকেছে, তাঁর কপালের উপর চিন্তার হলকর্ষণ।

জীবনের স্রোতের মুখে যে তুলে দিয়েছে হাসির ফুরফুরে পাল, বিনয়েন্দ্র এই ধ্বংসের দৃশ্যের মুখোমুখি একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে পড়লেন; একটা কথা খুঁজে পেলেন না বলবার। একটু পরে কল্যাণকুমার মুখ তুলে অত্যন্ত সহজভাবে জিগেস করলেন, 'কোথায় ছিলে এতদিন?'

'টেনিংয়ে গিয়েছিলুম—ক্যাম্পে।'

'আমি তোমার কথা ভেবেছি—চিঠি লেখোনি কেন? আমাদের কথা কি মাঝে-মাঝে তোমার মনে পড়েছিলো?'

আশ্বস্ত, আত্মস্থ, বিনয়েন্দ্রের চোখ হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।—'আ! মনে-মনে আমি তোমাদের সঙ্গেই ছিলুম।'

'Eh?' কল্যাণকুমারের ঠোঁটের কোণে লুকোনো ছোটো একটা সাপ হঠাৎ গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠলো: 'You were with us all along, were you? I knew it!'

'হাসছো কেন?'

'হাসবো না? It's so funny!' কল্যাণকুমার পিছন দিকে

মাথা হেলিয়ে হেসে উঠলেন, 'Have a cigarette.' তারপর সিগারেট ধরিয়ে নীল ধূম্রেখার ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করতে-করতে :

'And so you have come to see how I am? But I am all right, thank you. Nothing is the matter with me. I am happy, I am chirpy. La-la!' মেঝেতে দু'বার পা ঠুকে তিনি গুনগুন ক'রে উঠলেন।

'সুখী না-হবার কোনো কারণ তো তোমার নেই।'

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট আটকানো, কল্যাণকুমার খানিকক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সিগারেটটা থুতুর মতো মুখ থেকে ছুঁড়ে ফেলে ব'লে উঠলেন: 'Ah, you! The picture of happiness! You paintface! Why have you come again? Is it to laugh at me? But I'll get the better of you yet!' এমন আকস্মিক ও এমন প্রচণ্ডভাবে তিনি হেসে উঠলেন যে বিনয়েন্দ্রের হাত থেকে সিগারেটটা খ'সে প'ড়ে গেলো।

নিচের ঘরে বাবা বিনয়েন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দু'জনের চোখাচোখি হ'লো। খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললেন না।

বাবাই প্রথমে কথা বললেন: 'আপনিই বলতে পারবেন। বিলেতে থাকতে কি ওর মধ্যে কোনোরকম—অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন?'

বিনয়েন্দ্র মাথা নাড়লেন।—'সেই অস্বাভাবিকতাই তো ওর

স্বাভাবিক ছিলো। He was moody. He was awfully serious.'

'আপনি কি বলতে পারেন, ওখানে গিয়ে বিশেষ-কোনো ঘটনা—'

'না। ওখানে গিয়ে পরীক্ষার জন্য পড়া—আর স্ত্রীকে চিঠি লেখা, এই তো ওর দুটো কাজ ছিলো।'

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অন্যায়, অন্যায়, পুরুষমানুষের পক্ষে কোনো মেয়েকে অত বেশি ভালোবাসা অন্যায়। সেটা আত্ম-বিনাশের পথ। পুরুষের যদি কোনো স্বতন্ত্র দিন-জীবন না থাকে—কোনো উদ্দেশ্যের প্ররোচনায়, কর্মের উদ্‌যাপনে যদি তার দিন না কাটে, তাহ'লে সে বাঁচে কী ক'রে।

যেন বাবার মনের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বিনয়েন্দ্র বললেন: 'আসল কথা, ওর এখন কোনো কাজ দরকার। This brooding does him no good. এ কিছু নয়, ও একটু একসেনট্রিক তো বরাবরই।'

কিছু নয়, আমরা প্রাণপণে নিজেদের বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করলাম, এ কিছু নয়। আর হঠাৎ এক-এক সময় তা বিশ্বাস করবার কারণও যেন পাওয়া যেতো। প্রশান্ত বিরতি আসতো মাঝে-মাঝে। তখন তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতেন, ভালো কাপড়-চোপড় পরতেন, অপর্ণা-দিকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন কোনো-খানে—আমাকে আর মায়াকেও যেতে হ'তো সঙ্গে। মা-র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠতেন হঠাৎ। কি কোনোদিন

দেখা ক'রে আসতেন কোনো কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে। প্রবন্ধ লিখতে বসতেন ক্যালকাটা রিভিয়ুর জন্য। একটা পাথর স'রে যেতো আমাদের বুকের উপর থেকে। বাড়িতে শোনা যেতো হাসির শব্দ। দিগন্ত জ্ব'লে উঠতো আশার সোনায়।

ইন্দোরে রাজার কলেজে প্রোফেসরি খালি ছিলো, বাবা জোর ক'রে কল্যাণকুমারকে দিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। সেদিন জবাব এসেছিলো—ইণ্টরভিয়ুর জন্য ডেকেছে। অনেকদিন পর সুখের হাওয়া দিয়েছিলো বাড়িতে। রাত্রে খাওয়ার পর অপর্ণা-দি হঠাৎ আমার কাছে এসে বললেন :

'নীল, তাস খেলবে?'

গেলো কয়েক মাসের মধ্যে অপর্ণা-দি আমার সঙ্গে সব সুদ্ধ ছ'টা কথা বলেছিলেন কিনা সন্দেহ। কথা বলবার অবস্থা তাঁর ছিলো না। চোখে তাঁর কালি পড়েছে, মুখ শীর্ণ। সবার চোখ এড়িয়ে নিজের মনে তাঁর সেই দীর্ঘ, দীর্ঘ কান্না—আমি তা সহজেই বুঝতে পারতুম। কে-ই বা না পারতো?

কিন্তু সেদিন তাঁকে দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেলুম। পান খেয়েছেন। টুকটুক করছে ঠোঁট। হালকা-নীল শাড়ি ভালোবাসার মতো তাঁকে জড়িয়ে আছে। যেন চোখের সামনে দেখলুম অতীতের একটা অপভ্রংশ। অতীত?—এই তো সেদিনের কথা, এরই মধ্যে অতীত হ'য়ে গেলো?

'চলো', তাঁর কণ্ঠস্বর গানের মতো বেজে উঠলো, 'তোমার ঘরে গিয়ে বসি, চলো। ওখানেই বেশ নিরালা।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম : 'আর কে খেলবে ?'

'আর কে ? বোঝো না ?' অপর্ণা-দি মুখ টিপে হাসলেন, 'তা না-হ'লে কি আর তোমার মতো ছেলের তাস খেলায় উৎসাহ !' আমার সমস্ত মুখের উপর এমন গভীর হ'য়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়লো যে আমার ঘননীল বর্ণও তা গোপন করতে পারলো না। 'ঈশ, একেবারে টুকটুকে হ'য়ে উঠেছো যে !' অপর্ণা-দি ঠাট্টা করলেন, 'মায়াকে এইমাত্র না এখানে দেখলুম, কোথায় গেলো আবার ? মায়া !'

'বৌদি, ডাকছিলে ?' বলতে-বলতে মায়া এসে দাঁড়ালো।

'না, আমি না। এই ভদ্রলোক বলছিলেন তোমার সঙ্গে এঁর কী জরুরি কথা আছে।'

মায়ার একটা দ্রুত দৃষ্টি আলোর [illegible]বর মতো আমার উপর এসে পড়লো, চোখে-চোখে জ্ব'লে উঠলো বিদ্যুৎ। তারপর মায়া ঘাড় থেকে কান পর্যন্ত লাল হ'য়ে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'ভদ্রলোকটির যদি অসুবিধে হয়', অপর্ণা-দি বলতে লাগলেন, 'আমি না-হয় এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি। কিন্তু ভদ্রমহিলাটির মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কথাটা বলা হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে।'

'বৌদি, চুপ করো', একটু পরে চেষ্টা ক'রে মায়া বললে।

'চুপ করবো ? কিন্তু, মায়া, চুপ ক'রে থেকে এত কথা বলতে তো সবাই পারে না।'

এ-সব কথা শুনতে-শুনতে, রক্তের মধ্যে উষ্ণ কটাক্ষ-সঞ্চার

অনুভব করতে-করতে মুহূর্তের জন্য নেশা ধ'রে গেলো আমার। হাওয়া দিলো বসন্তের—এরই মধ্যে অতীত, আমাদের সেই বারান্দার আর সন্ধ্যার বাণীময় বসন্তের। অনেক, অনেকদিন পর। আ, আমি ভেবেছিলুম তা হারিয়ে গেছে। ভালোবাসা কি হারায়? একদিন যদি বাণীর কলরোলে মনের অন্ধকার আলো হ'য়ে উঠে থাকে, তার আভা কি মিলিয়ে যেতে পারে কখনো?

অপর্ণা-দি বললেন, 'মায়া, তাস-জোড়া কোথায়?'

'আছে আমার কাছে। খেলবে?'

'সে-রকম একটা ইচ্ছা তো ছিলো মনে-মনে।'

'এখন?'

'এখন না-হ'লে আর কখন। ইন্দোরে যদি যাওয়া হয়—' অপর্ণা-দি হঠাৎ থেমে গেলেন।

'ভালো তো', মায়া বললো, 'ইন্দোর শুনেছি চমৎকার জায়গা।

'কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে তো তাস খেলা যায় না।'

'এ-রকম একটা কথা যেন শুনেছিলুম', আমি বললুম, 'যে ইন্দোরে মানুষও আছে।'

'মানুষ নেই কোথায়? তবু তো মানুষেরই জন্য মানুষের এত হাহাকার।'

একটু চুপচাপ: যতক্ষণ হালকা সুর ছিলো, ততক্ষণই ছিলো ভালো। আমি রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম।

'এতদিন পরে', অপর্ণা-দি বলতে লাগলেন, 'যদি তোমাদের

ছেড়ে যেতে হয়—' তারপর, একটু থেমে : 'কিন্তু আবার তো দেখা হবেই। ছুটি আছে। আর, তোমরাও যাবে—যাবে না? মায়া তো যাবেই কিছুদিন পরে। তুমিও এসো, নীল।' আর, একটু পরে, ক্ষীণ হেসে :

'দু' জনে একসঙ্গেই এসো।'

তাস-খেলার জন্য চারজন হ'লে ভালো হয়। অপর্ণা-দি একটু ভেবে বললেন, 'ঠিক। মায়া, তোমার দাদাকে ডেকে আনো।'

'দাদা পড়ছেন।'

'কী দিন-রাত পড়া!' অপর্ণা-দি নিজেই উঠলেন স্বামীকে ডাকতে।

কিন্তু কল্যাণকুমার এলেন না। 'The Golden Bough'-এর শেষ পরিচ্ছেদ পড়ছিলেন তিনি, শেষ না-ক'রে উঠবেন না। অগত্যা তিনজনেই খেলতে হ'লো।

আমার ঘরে গিয়ে আমরা বসলুম। খেলা তো কিছু না—তাসে তিনজনেই সমান ওস্তাদ—গল্প আর হাসি—আসলে, খেলাটা অন্য রকম, তাসটা অছিলা মাত্র। খুশির ঢেউ এসে লাগছে মন থেকে মনে—অকারণে, যে-কোনো তুচ্ছ কথা ব'লে আমরা হেসে উঠছি। দেখতে-দেখতে এক বাজি হ'য়ে গেলো।

দ্বিতীয় বাজির জন্য যখন তাস বিতরণ করা হচ্ছে, হঠাৎ নিঃশব্দে কল্যাণকুমার ঘরের মধ্যে এলেন। অপর্ণা-দি হেসে জিগেস করলেন : 'কী, তোমার চ্যাপটর শেষ হ'লো?'

"খুব যে হাসাহাসি তোমাদের! এত ফুর্তি কিসের?"

অপর্ণা-দি তাস তুলতে-তুলতে বললেন, 'এবার ইস্কাবনের বিবি মায়াকে।'

কল্যাণকুমার বললেন, 'অপর্ণা, শুতে এসো, রাত কম হয়নি।'

তাসের দিকে তাকিয়েই অপর্ণা-দি বললেন, 'এই না দেখলুম বইয়ে ডুবে আছো, এত ব্যস্ত কেন এখনই?'

কল্যাণকুমার আমাদের প্রত্যেকের দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে আর-কোনো কথা না-ব'লে চ'লে গেলেন।

আমি একবার বললুম, না-হয় থাক, কিন্তু অপর্ণা-দি আমার কথা কানে তুললেন না।

একটু পরেই কল্যাণকুমার আবির্ভূত হলেন আবার। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই বললেন: বাঃ, খেলা খুব জমেছে!'

অপর্ণা-দি বললেন: 'এসো না তুমিও।'

'I won't be in the way', ব'লে কল্যাণকুমার অদৃশ্য হ'লেন, কিন্তু পরের মুহূর্তেই ফিরে এসে বললেন, 'আমি চললুম শুতে। বুঝলে, শুতে চললুম।' আমাদের দিকে তাকিয়ে ব্যাপকভাবে হাসলেন তিনি।—'Well, good-night. Don't stint yourselves in any way. Good-night'.

খেলা সত্যি জ'মে উঠেছিলো। কখন যে কল্যাণকুমার আবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা কেউ দেখতে পাইনি। শেষ হ'লো বাজি। অন্য দু' জনে মিলে আমাকে কোণঠাসা করেছিলো। অপর্ণা-দি তাস মেশাতে-মেশাতে বললেন,

'কেমন !' হঠাৎ, আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে কল্যাণকুমার হেসে উঠে বললেন, 'কেমন !'

'কী হ'লো ? ঘুমোলে না ?'

'তোমাদের ফুর্তি দেখতে এলুম। দোষ হয়েছে কোনো ?'

'বোসো না, কী মজার খেলা হচ্ছে ছাখো', খুশিতে, তাসে জেতবার উৎসাহে, অপর্ণা-দি জ্বলজ্বলে।

'There's a lot of fun in it, I'm sure', কল্যাণকুমার দরজার ধারে এসে একটু দাঁড়ালেন। 'Have all the fun you want. I'm off to bed.'

তারপর, দরজার বাইরে এক পা রেখে, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে :

'তুমি শুতে আসবে না ? রাত তো অনেক হ'লো।'

'হোক না। রাত তো হবারই জন্যে', বেপরোয়া আনন্দ অপর্ণা-দির।

'That's right.'

কল্যাণকুমার অদৃশ্য হওয়া মাত্র অপর্ণা-দি বললেন, 'তখন এত ক'রে ডাকলুম, এলো না—আর এখন বার-বার ঘোরাঘুরি। আবারও আসবে, দেখো। দাও তো দরজাটা বন্ধ ক'রে—খুব জব্দ হবে তাহ'লে।'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'না, থাক।'

'ছাখো একটা মজা করি।' হাতের তাস রেখে অপর্ণা-দি হাসতে-হাসতে উঠলেন, উঠে সত্যি-সত্যি বন্ধ ক'রে দিলেন দরজা। ফিরে এসে বললেন, 'তোমার খেলা, মায়া।'

তাস খেলতে অপর্ণা-দি সত্যি ভালোবাসতেন। তা ছাড়া, সেদিন বোধহয় তিনি মনে-মনে ধ'রেই নিয়েছিলেন যে স্বামী চাকরি নেবেন ইন্দোরে; একলা স্বামীর সঙ্গে বিদেশে গিয়ে সংসার পাতবার আনন্দে, আবার আমাদের সকলকে ছেড়ে যাবার কষ্টে তাঁর মনটা যেন থরথর ক'রে কাঁপছিলো। তিনি আনন্দের ঝোঁক সামলাতে পারেননি—নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন আবেগের স্রোতে। অত চঞ্চল, অত উচ্ছল, অমন লীলায়িত তাঁকে আমি কখনো দেখিনি।

কয়েক মিনিট পরে দরজায় টোকা। অপর্ণা-দি ঠোঁটের উপর এক আঙুল রেখে আমাদের চুপ ক'রে থাকতে ইঙ্গিত করলেন। টোকা পড়তে লাগলো ঘন-ঘন।

একটু পরে অপর্ণা-দি যেই উঠতে যাচ্ছেন, আমরা শুনলাম কল্যাণকুমারের ফিরে যাওয়ার পায়ের শব্দ।

হাতের বাজি শেষ ক'রেই অপর্ণা-দি উঠলেন।—'আজ আর না। কাল আবার।—নীল, তুমি একেবারে আনাড়ির মতো খেলো', বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'তখন যদি পাঞ্জাখানা ছেড়ে না-দিতে—'

'হাতে তিরি থাকতে', মায়া জোগান দিলো, 'যে দশ ছেড়ে দেয়, তাকে নিয়ে আবার কথা।'

'মায়ার কিন্তু জোর বরাত!' অপর্ণা-দি দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালেন।—'এ কী? দরজা খুলছে না কেন?

আমি গিয়ে টানাটানি করলুম। তাই তো, দরজা বাইরে

থেকে বন্ধ। 'ছাখো ওর কাণ্ড! নাঃ—' অপর্ণা-দি দরজায় ধাক্কা দিতে-দিতে বললেন, 'এই, খোলো না দরজা।'

একটু পরে বাইরের খিল খোলার শব্দ হ'লো। কল্যাণ-কুমারের দৃষ্টি অপর্ণা-দিকে পার হ'য়ে আমার উপর এসে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি দাঁত বের ক'রে হেসে ফেললেন। ঘরের ভিতরে এসে বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন: 'কী হে নীলকণ্ঠ, তোমাদের সভা ভাঙলো?'

অপর্ণা-দি বললেন, 'ওঃ, যা খেলা হ'লো! তুমি যদি—'

'এরই মধ্যে শেষ করলে কেন?' কল্যাণকুমারের মোটা গলা গুমগুম ক'রে উঠলো, গোল-গোল চোখে চারিদিকে একবার তাকালেন, 'আরো খেললেই পারতে—যতক্ষণ তোমাদের ইচ্ছা। নীলকণ্ঠ কী বলে?' হঠাৎ তিনি তাঁর জ্বলন্ত চোখের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আমার উপর ফেললেন, 'The society of handsome ladies is pleasant, eh?' মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুখ তাঁর আরক্ত হ'য়ে উঠলো, 'Late at night, particularly. Late at night, and shut up in a room. Ah, you are a fine young man!' এত দ্রুতবেগে কথা বলতে লাগলেন যে আমরা তিনটি প্রাণী বুঝতেই পারলুম না ব্যাপার কী, আর তারপর হঠাৎ তিনি দুই ভয়ংকর, ভারি হাত দিয়ে আমাকে কাঁধে ধ'রে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে-দিতে বলতে লাগলেন: 'Late at night, late at night. When darkness closes, and the stars open their hearts like fiery flowers—

you have read poetry, you are a poet. A poet. A worshipper of goddesess. And I will kill you, I will kill you !'

সেদিন আমি কী ক'রে যে মৃত্যু এড়িয়েছিলাম, তা ভেবে এখনো আমার অবাক লাগে। কী কাণ্ড !—মা-বাবা ঘুম থেকে উঠে এলেন, অবিশ্রান্ত অনর্গল ইংরেজি প্রলাপ বকতে লাগলেন কল্যাণকুমার, মায়া কাঁপতে লাগলো থরথর ক'রে, আর যে-টেবিলে ব'সে একটু আগে কত সুখী আমরা ছিলুম, সেই টেবিলে মাথা রেখে অদম্য, আত্মহারা উচ্ছ্বাসে অপর্ণা-দি কেঁদে-কেঁদে যেন গ'লে যেতে লাগলেন। ঘণ্টাখানেক পরে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা নামলো বাড়িতে।

কোথায় গেলো ইন্দোর ! কোথায় মিলোলো মুহূর্তের জন্য জ্ব'লে-ওঠা সোনালি দিগন্ত। মা-বাবা বুঝলেন, কিছু একটা ব্যবস্থা না-করলে আর চলে না। ঠিক হ'লো, স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা একটা বাড়িতে একা রাখা হবে। তাতে যদি কিছু হয়। কাছাকাছি ছোটো একটা বাড়ি নেয়া হ'লো ক'দিনের মধ্যেই। টেলিগ্রাম করা হ'লো কাকাবাবুকে।

অপর্ণা-দিকে বুকের কাছে টেনে এনে, তাঁর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে মা বললেন :

'মন-খারাপ করিসনে।'

অপর্ণা-দি বললেন, শান্তভাবে : 'আমি যদি মন-খারাপ করতাম, তাহ'লে কি বাঁচতাম ?'

মা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে। আরো অনেক কথা তোলপাড় করছিলো তাঁর মনে। কিছুই বলা হ'লো না। পরের দিন অপর্ণাকে বিদায় দিতে হ'লো।

৬

নতুন বাড়িতে গিয়ে মাস দুয়ের বেশি থাকা হয়নি তাঁদের। এ-সময়কার কথা বেশি বলবো না। মা আমাকে চুপে-চুপে ব'লে দিয়েছিলেন, ও-বাড়িতে যেন আমি না যাই। মা-র আদেশ শিরোধার্য করেছিলুম।

মামা যেতো দু' বেলা। মা যেতেন। প্রথম কয়েকদিন, দেখা গেলো, তাঁরা বেশ আছেন। তাঁরা মানে—কল্যাণকুমার। অপর্ণা-দি তো ভালো-থাকা মন্দ-থাকার বাইরে। তাঁর যেন কোনো অনুভূতি নেই, প্রাণ নেই। মেয়েরা এত কোমল—আমরা তাদের ঠাট্টা করি—একটুতেই ছলছলিয়ে ওঠে তাদের চোখ। কিন্তু দুঃখ সহ্য করতে তো মেয়েরাই পারে। প্রকৃতিতে একটা ক্ষতি-পূরণের, মাত্রা-নিরূপণের ব্যবস্থা আছে। কথাটা পুরোনো; কিন্তু আমি তা উপলব্ধি করি সেই সময় অপর্ণা-দিকে দেখে। তিনি যেন ভিতরে-বাইরে জ'মে পাথর হ'য়ে গিয়েছিলেন।

কাকাবাবু এলেন টেলিগ্রাম পেয়ে। জামাই যখন ফিরলেন বিলেত থেকে, তখন একবার এসেছিলেন দিন দু'য়ের জন্য, তারপর এই। বাবার মুখে শুনলেন কথা, দেখলেন মেয়ের প্রাণহীন পাংশুতা, জামাইকে পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর বললেন—'কিছু না! নিষিদ্ধ পানাহার করেছে বিলেতে, প্রায়শ্চিত্ত করলেই

সেরে যাবে।' কথা শুনে বাবা মর্মাহত হলেন, তর্ক করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু তর্ক কার সঙ্গে? তিন দিনের দিনই আবার ফিরতি গাড়ি ধরলেন—নিষিদ্ধ পানীয়ের দোকান একটা বাগিয়ে এনেছেন অনেক চেষ্টায়—এখন না-গেলে চলবেই না!

বিনয়েন্দ্র মাঝে-মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন। তাঁকে অবশ্য ও-বাড়িতে যেতে দেয়া হ'তো না। এই শিশু-স্বভাব লোকটির মনে অদ্ভুত আঘাত দিয়েছিলো এই ঘটনা। জীবনকে তিনি যেমন পেয়েছিলেন, যেমন ধারণা করেছিলেন, তার সঙ্গে এর কিছুই মেলে না। এ একেবারে খাপছাড়া, একেবারে অবান্তর। এ-ও কি বিশ্বাস করতে হবে? তিনি ব্যক্তিগত শোক যতটা না পেলেন, ভাবগত আঘাত পেলেন তার বেশি। চলতে-চলতে হুঁচট খেলেন যেন, নৈতিক কারণে ক্ষুব্ধ হলেন, ব্যাপারটা তাঁর মনে হ'তে লাগলো আগাগোড়া একটা বিরাট স্ক্যাণ্ডল। যদি কোনো গভীর অনুভূতির ক্ষমতা ভদ্রলোকের থাকতো, তাহ'লে এই মোহ-ভঙ্গ তাঁর আরামে গাঁথা বিশ্বাসের দেয়ালে একটা স্থায়ী ফাটল ধরিয়ে দিতে পারতো।

কয়েকদিন পর মায়া এসে বললো, 'বৌদি একবার যেতে বলেছেন তোমাকে।'

'আমাকে!'

'একবার গেলেই না-হয়—কী আর হবে।'

মা বললেন: 'বেশ, যাও। কিন্তু বেশিক্ষণ থেকো না—আর একটু বুঝে-সুঝে চোলো।'

সন্ধ্যাবেলা। অন্ধকার, সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মায়ার পিছন-পিছন উঠতে-উঠতে আমার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগলো। বাড়িটা বড়োই চুপচাপ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মায়া ডাকলো : 'বৌদি।'

ভিতর থেকে সাড়া এলো, 'এসো।'

ঘরের ভিতরে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। লণ্ঠন জ্বলছে জানলার ধারে টেবিলের উপর। আসবাব অল্প, তাড়াহুড়োতে যথোচিত উপকরণের ব্যবস্থা করা যায়নি; বেশি জিনিশের প্রয়োজনও ছিলো না, তাছাড়া। সদ্য চুনকাম-করা দেয়ালগুলি কর্কশ শাদা। একটা বিশীর্ণ বিশ্রী নগ্নতা সমস্ত ঘরে ছড়ানো, ঘরটা যেন ঘরের কঙ্কাল।

তক্তপোশে সুজনি দিয়ে ঢাকা বিছানা পাতা, তারই এক প্রান্তে অপর্ণা-দি বসেছেন হাঁটুর উপর কনুই রেখে। টেবিলে ঝুঁকে চেয়ারে ব'সে কল্যাণকুমার। লণ্ঠনের আলো ঘরের দেয়ালে তাঁর মাথার বিরাট নিরবয়ব ছায়া ফেলেছে।

অপর্ণা-দি উঠলেন না, নড়লেন না। আমরা দু' জন এগিয়ে গিয়ে সেই তক্তপোশেরই অন্য প্রান্তে বসলুম। অপর্ণা-দি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছো?'

এ-প্রশ্ন আমারই করবার কথা। চুপ ক'রে রইলুম।

কিছু বলবার ছিলো না, মুহূর্তের মধ্যেই আমার যেন দম আটকে এলো। মনে হ'লো, দেয়ালগুলি ফিশফিশ ক'রে কথা

বলছে, কালো-কালো ছায়া কোনো অশুভ রাত-পাখির ডানা। 'অপর্ণা-দি এখানে আছেন কী ক'রে ?

কল্যাণকুমার আমাদের একেবারে লক্ষ্যই করলেন না। হঠাৎ অপর্ণা-দির দিকে তাকিয়ে বললেন : 'দেরি কোরো না, লেখো চিঠিটা।'

'তোমার চিঠি তুমি লিখলেই ভালো হয় না ?'

'না, তুমিই লেখো। এত সুন্দর হাতের লেখা তোমার—বিনয় খুশি হবে।'

'এখন থাক, কাল লিখবো।'

'না, এখনই। এখনই লেখো। ভীষণ জরুরি চিঠি—বোঝো না কেন ?'

অপর্ণা-দি চকিতে একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, 'আচ্ছা, লিখছি, লিখছি।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। এই নাও।' কল্যাণকুমার কাগজ-কলম বাড়িয়ে দিলেন, 'লেখো।' তারপর, লণ্ঠনের চিমনির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ব'লে যেতে লাগলেন :

'প্রিয় বিনয়, এই চিঠি পেয়েই তুমি চ'লে আসবে। আমাকে হতাশ কোরো না—ভীষণ ইচ্ছে করে তোমাকে দেখতে। তুমি না-থাকলে ভালো লাগে না কিছুই। তুমি না-থাকলে—' হঠাৎ একটু থেমে তিনি বললেন, অপর্ণা-দির চোখের উপর চোখ রেখে : 'কিন্তু আমি ব'কে মরছি কেন—তুমি নিজেই লিখতে পারো।

আমি বিলেতে থাকতে আমাকে তো কতই লিখতে—ঠিক সেইরকম লেখো দেখি ভালো ক'রে।'

অপর্ণা-দি কোলের উপর কাগজটা নামিয়ে রাখলেন। আমি আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখলুম, সেখানে হিজিবিজি আঁচড়-কাটা। বললেন, 'আচ্ছা, দেবো'খন লিখে।'

কল্যাণকুমার হঠাৎ অজস্র খুশিতে হেসে উঠলেন।—'দেখো, ও ঠিক হাজির হবে এসে। ঠিক আসবে। উঃ, কী মজা!'

একটু ফাঁক পেয়ে আমি বললুম, 'দিদি, চলি এবার।'

অপর্ণা-দি আপত্তি করলেন না, কোনো কথা বললেন না। সিঁড়ি পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিলেন। একটা সিঁড়ি নেমে আমি মুখ ফিরিয়ে জিগেস করলুম, 'আমাকে ডেকেছিলে—কোনো দরকার ছিলো?'

'না।. তোমাকে—দেখলুম।'

দরকার কিছু ছিলো কিনা তা জিগেস করাই বৃথা। পৃথিবীতে কোনো মানুষকে দিয়ে অপর্ণা-দির আজ আর কোনো দরকার নেই।

একটু সময়, বাইরে এসে পাশাপাশি হাঁটলুম আমি আর মায়া। তারপর আমি বললুম, 'আমাদের কী উপায় হবে বলতে পারো?'

'কার?'

'দিদির।—তোমার, আমার।'

মায়া আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো: 'ভেবে কী হবে।' বাকি রাস্তাটুকু আর-কোনো কথা হ'লো না।

এর পরে একদিন একাই গেলুম ও-বাড়িতে। দিনের বেলা। ঘরে ঢুকে দেখলুম, বিছানায় কল্যাণকুমার ঘুমুচ্ছেন, অপর্ণা-দি শুয়ে আছেন মেঝেতে পাটি বিছিয়ে। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। লক্ষ্য করলুম, তাঁর মুখে এখানে-ওখানে কালো-কালো দাগ।—'ও কী ?'

অপর্ণা-দি কথা না-ব'লে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তোমাকে—মেরেছে ?'

অপর্ণা-দি চুপ। অসহ্য স্তব্ধতায় কাটলো কয়েক মিনিট। তারপর, তক্তপোশের দিকে একবার তাকিয়ে আমি বললুম, 'ওকে কেউ মেরে ফেলতে পারে না ?'

অসীম ক্লান্তিতে ভরা অপর্ণা-দির চোখ আস্তে-আস্তে আমার মুখের উপর নিহত হ'লো। অসীম ক্লান্তিভরা চোখে, নিশ্বাসের মতো মৃদুস্বরে বললেন, 'তাতে কি আমার সুখ হবে ?'

তাই তো, সে-কথা ভেবে দেখিনি।

৭

তারপর—তার পরের কথা আর কী বলবো? কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেলো, আর চলবে না। তাঁদের বাড়ির পাশে যারা থাকতো, তারা এসে নানারকম কথা বলতে লাগলো। রাত্রে কল্যাণকুমার প্রায়ই অত্যন্ত অশান্ত হ'য়ে ওঠেন, মেয়েলি গলার চাপা কান্নার শব্দ হাওয়ায় ভেসে আসে কখনো বা। 'বৌটাকে একদিন ঠিক মেরে ফেলবে—আপনারা করছেন কী?' তাছাড়া পাড়ার মধ্যে এ কী উপদ্রব, সবাই ভয়ে-ভয়ে থাকে। একটা বিহিত না-করলে কি চলে।

বিহিত করতে হ'লো। পশুশক্তি প্রয়োগ ক'রে কল্যাণ-কুমারকে বন্দী করতে হ'লো ঘরের মধ্যে। অপর্ণা-দি ফিরে এলেন আমাদের বাড়িতে। এলেন আরকি—না-এলেই যেন ভালো ছিলো। শেষ কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো কৃশ আর মলিন—মৃত্যুর ছায়া পড়েছে মুখে।

কিন্তু কখনো মুখ ফুটে তিনি কোনো একটি কথাও বলেননি। সেই উন্মাদের হাতে যত অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন, তার বেশির ভাগ আর-কেউ জানবে না কখনো। আমি যদি বিধানকর্তা হতুম, তাহ'লে অনেক আগেই অপর্ণা-দিকে মুক্ত ক'রে তো আনতুম—তারপর যা হবার হ'তো। কিন্তু মা-বাবা সহ্য করেছিলেন—আশা করেছিলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা

করেছিলেন। তাঁদের দোষ দিই না। হিন্দু সমাজের এ-ই ঐতিহ্য। স্বামীকে অবলম্বন ক'রেই বাঁচতে হবে স্ত্রীকে। যদি তাতে বাঁচা না যায়, তবু। যদি ম'রে যেতে হয়, তবুও। আমার কোনো-রকম হাত থাকলে অপর্ণা-দিকে আমি মরতে দিতুম না।

তিন মাস ধ'রে দীর্ঘ, জটিল চিকিৎসা চললো নানারকমের। টাকার ঢল নামলো। ঐ বাড়িতেই কল্যাণকুমারকে রাখা হ'লো— লোক-জনের পাহারায়, কড়া ব্যবস্থায়। মা-র শরীর ভাঙলো; হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো যে বাবা বুড়ো হচ্ছেন।

আবার টেলিগ্রাম ক'রে আনানো হ'লো কাকাবাবুকে। এবার আর তিনি প্রায়শ্চিত্তের কথা বললেন না, ডেকে আনলেন শহরের এক বিখ্যাত কবিরাজ, পরের দিনই আবার আর-একজন; বাবাকে বকলেন; মা-কে ব'কে আর রাখলেন না; কাঁদলেন, ঈশ্বরকে শাপ দিলেন, হৈ-চৈ করলেন; এক পাগলের সঙ্গে যেন আর-এক পাগল জুটলো। তারপর, সাতদিনের মধ্যে আমাদের সব পার্থিব ও আত্মিক ঔদাসীন্যের ক্ষতিপূরণ ক'রে ফিরে গেলেন কর্মস্থলে তাঁর এণ্ডি মুগা চায়ের বাগান মদের দোকানে— তিনি যাওয়াতে বাড়ির অশান্তি একটু যেন কমলোই, সত্যি বলতে।

শেষটায়, বিবিধ পদ্ধতির চিকিৎসা যখন নিঃশেষ হ'লো, আমাদের ধৈর্য আর শক্তি যখন ঠেকলো তলানিতে এসে—ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, অর্ধ-মৃত, আমাদের আর-কিছুই করবার রইলো না। স্বয়ং ঈশ্বর যখন বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তখন মানুষের আর কী

করবার থাকে। শরণ নিতে হলো রাঁচির। আর রাঁচির চিকিৎসালয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন কল্যাণকুমার।

বাঁচা গেলো—আমাদের প্রত্যেকের গহনতম অভ্যন্তর থেকে অনেকদিনের অবরুদ্ধ একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো—বাঁচা গেলো। ঝড় কেটে গেলো : এবার শান্তি। হোক তা মৃত্যুর মতো স্তব্ধ, মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর—তবু তো শান্তি। বিছানায় পাশ ফিরে আমরা চোখ বুজলাম। ঝড় কেটে গেছে—ধ্বংসের রেখা এঁকে দিয়ে গেছে আমাদের জীবনের উপর। তা হোক, আমরা এখন ঘুমুবো। গোল কোরো না তোমরা, একটু ঘুমুতে দাও।

৮

মা বললেন : 'অপর্ণা, তুই তোর মা-র কাছে গিয়ে থাকবি কিছুদিন ?'

'তোমাদের কাছেই বেশ আছি।'

'জায়গা বদলালে মনটা হয়তো—'

'আমার কাছে সব জায়গাই সমান।'

'তবু একবার ঘুরে এলে দোষ কী। আর শরীরও—'

'শরীর!' ঐ একটি কথা দিয়ে অনেক কথা বললেন অপর্ণা-দি।

'তাছাড়া,' মা একটা যুক্তি বের করলেন : 'মা-র সঙ্গে কতকাল তোর দেখাও হয় না।'

যদি এতদিন দেখা না-হ'য়ে চ'লে থাকে, তা-হ'লে এখনো চলবে, দেখা হবার সময় এটা নয়—আমার মা তা জানতেন। তিনি জানতেন, তার নিজের পরিবারের সঙ্গে অপর্ণার হৃদয়ের যোগাযোগ শিথিল। তার দুর্ভাগ্যকে সে চাপাতে চায় না তাদের উপর, তার এই ধ্বংসস্তূপ-জীবন নিয়ে দেখা দিতে চায় না তাদের সামনে। কিন্তু মা মনকে বেঁধেছিলেন শক্ত ক'রে। সমস্ত কান্নার আর প্রার্থনার অতীত, মীমাংসা যখন হ'য়ে গেলো, তখন তিনি যেন ব্যাপারটাকে যা-হোক ক'রে মেনে নিলেন। তাঁর সেই দৃঢ়তায় নিজের প্রতি নিষ্ঠুরতা ছিলো ; দূর থেকে লক্ষ্য

ক'রে বিস্ময় জাগতো আমার, সম্ভ্রম হ'তো। তাঁরই মধ্যে তখন আমরা—এই নাটকের কয়েকটি পাত্র-পাত্রী—আশ্রয় পেয়েছিলুম। বেঁচে গিয়েছিলুম তাঁরই শক্তিতে। তিনি এমন ভাণ করতেন যেন কিছুই হয়নি। একজনের জন্য আর-একজনের বিনাশ তিনি হ'তে দেবেন না কিছুতেই। তাই তিনি তাঁর অপর্ণাকে গৌহাটিতে পাঠাবার জন্য একটু স্পষ্টতই ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন। জীবনের সোনার তরী যেখানে ভ'রে উঠলো, আর যেখানে ভরা তরীর ভরাডুবি হ'লো, সেখান থেকে অন্য কোথাও না-গেলে মেয়েটা জীইয়ে উঠবে কেমন ক'রে? অপর্ণাকে যে বিয়ের পরে স্বামীর ঘরে পাঠাতে হবে, এ-কথা ভাবতে একদা তাঁর চোখে জল আসতো। আশাতীতভাবে, বোধহয় একটু বিকৃতভাবেই, বিধাতা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন। অপর্ণাকে স্বামীর ঘর করতে হ'লো না। অপর্ণাকে এনে দিলেন তাঁর কাছেই, চিরজন্মের মতো। —কিন্তু এই কি তিনি চেয়েছিলেন? যেন নিজের উপর, নিজের দুর্বলতার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এবার তিনিই চাইলেন তাকে দূরে পাঠাতে।

কিন্তু অপর্ণা-দি বললেন, 'এখান থেকে গিয়ে আমার ভালো লাগবে না কোথাও।'

'বেশ তো, ভালো না লাগে চ'লে আসতে কতক্ষণ।'

অপর্ণা-দি অনুনয় করলেন, 'আমি এখানেই থাকি।'

মা তবু অবিচলিত। 'গুমরে মরবে নাকি এখানে বসে? না, কিছুতেই না।' এখানে, এ-বাড়িতে অসংখ্য স্মৃতি, প্রত্যেক

কোণে-কোণে জ'মে আছে ব্যথার পুঞ্জ। নতুন জায়গায়—মানে ছেলেবেলার পুরোনো জায়গায়—নিজেকে আবার নতুন লাগবে, ওর মন অবসর পাবে জীবনের মাটিতে নতুন শিকড় মেলে দেবার। কী আর হয়েছে—এর চেয়েও বড়ো দুঃখ সহ্য করতে হয় না মানুষকে?

বেশি প্রতিবাদ করবার শক্তি অপর্ণা-দির ছিলো না। শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা ছিলো না তাঁর। মা জেদ করলেন। এমনও মনে হ'তে পারতো যে অপর্ণা এ-বাড়ি থেকে চ'লে গেলে তিনি বাঁচেন। হয়তো তা খানিকটা সত্যিও। আর বোধহয় তাঁর সহ্য হচ্ছিলো না অপর্ণার ঐ মৃত্যুময় মূর্তি। হয়তো—বাইরে থেকে আমরা যেটুকু বুঝতে পারতুম তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি কষ্ট তিনি সহ্য করছিলেন নিজের মনে। অপর্ণাকে দূরে পাঠাবার চেষ্টা—এটা তার প্রতি তীব্র ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া। ভালোবাসার দায় অনেক, ভালোবাসার দুঃখ বিচিত্র।

গৌহাটি থেকে অপর্ণা-দি কয়েকটি চিঠি লিখেছিলন আমাকে। ছোটো চিঠি, বিষাদে মধুর, রুপালি-ধূসর। শোকের জড়িমা ঠেলে ফেলে তাঁর মন আস্তে-আস্তে যেন বেঁচে উঠছে। মা ঠিকই বুঝেছিলেন। সে-চিঠিগুলি আমি অনেকদিন রেখে দিয়েছিলুম সঙ্গে-সঙ্গে—কখন অলক্ষিতে কোন শূন্যতায় মিলিয়ে গিয়েছিলো জানতেও পারিনি। চিঠিগুলি এখন কাছে থাকলে ভালো লাগতো। এখন, এই গোধূলি-ম্লান আলোয় প'ড়ে দেখতুম আর-একবার। এ-ই তো সময়। কোনো কাজ নেই

এখন হাতে। অনেক দেখেছি, অনেক করেছি; এইবার গোধূলির ছায়া-স্নান। মুক্তিস্নান। আলো নিবে এলো, কথা বুজে এলো সমুদ্র-পার-হ'য়ে-আসা কোনো পাখির ক্লান্ত ডানার মতো। এই ক্লান্তির সঙ্গে স্বর মিলতো সেই চিঠিগুলির। কিন্তু নেই—অপর্ণা-দির একটি চিঠি আমার কাছে নেই—না চিঠি, না ছবি, না একগোছা চুল। কিছুই না।

৯

এইবার মা-র ভাবনা হ'লো মায়াকে নিয়ে। মায়ার নির্ভর এখন সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর। কিন্তু যার উপর নির্ভর ক'রে তার সারা জীবন কাটবে সে-মানুষ তো অন্য একজন। সন্ধান শুরু হ'লো তার।

বেশি দূর যেতে হ'লো না। বিনয়েন্দ্রকে পাওয়া গেলো হাতের কাছে। মা একদিন প্রসঙ্গক্রমে কথাটা পাড়লেন। একটু সূক্ষ্মভাবে, একটু আলগোছে। কিন্তু তার দরকার ছিলো না; বিনয়েন্দ্র সোজা কথার মানুষ। স্পষ্ট বললেন, 'আমার কি অমন সৌভাগ্য হবে?'

মায়ার বয়স তখন আঠারো। আর আমি সেবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি। সুতরাং আমিই ছোটো—আমার মা-র চোখে, সংসারের চোখে, সকলের চোখে। আমি আমলে আনবার মতোই নই। চিরকাল আমি নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, অবলুপ্ত। চিরকাল আমি নীরব। আমারও যে কোনো বিষয়ে কিছু বলবার থাকতে পারে, মা-র তা কখনো মনে হয়নি। মনে হবার কথাও নয়।

কিন্তু না, আর না। সময় এসেছে এইবার। আমার মন, আমার মনের কথা, এবার তুমি জ্ব'লে ওঠো খড়্গের মতো দীপ্ত। পার হ'য়ে যাও পরীক্ষা। ভয় কোরো না; আঘাতে বিপ্লবে

বন্যায় ভাসিয়ে দাও জীবনের প্রান্ত থেকে প্রান্ত। মন, আমার মন, ভয় কোরো না। তোমার জয় হবে। দু' হাত বাড়িয়ে দাও, ছিনিয়ে নাও দুঃসাহসে।—মায়া, মায়া, মায়া, তোমাকে ছেড়ে আমি কী ক'রে বাঁচবো।

রাত্রির অন্ধকারে, বালিশের উপর মুখ চেপে ধ'রে আমি বার-বার বলতে লাগলুম: 'তোমাকে ছেড়ে আমি কী ক'রে বাঁচবো?' অন্ধকার যেন নিশ্বাসের স্বরে বলতো: 'কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে?' মধ্যবর্তী দেয়ালের ভিতর দিয়ে পাশের ঘরে ঘুমোনো মায়াকে আমি স্পষ্ট ক'রে, নিবিড় ক'রে অনুভব করতাম। দেয়াল যেন স'রে গেছে, আড়াল যেন মুছে গেছে। আমি তাকে দেখতে পেতাম, খোলা চোখে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। সে বলতো মৃদুস্বরে, চুপে-চুপে, 'আমি যাবো না, তোমাকে ছেড়ে আমি যাবো না; আমাকে ধ'রে রাখো, আমাকে ধ'রে রাখো।'

তারপর, অনেক ঘুমহারা রাত কাটিয়ে, বাড়ির হাওয়া যখন বিবাহের প্রস্তাবনায় গুঞ্জিত, এক রাত্রে আমি মা-র কাছে গিয়ে বললাম, 'মা, মায়ার নাকি বিয়ে?'

মা কাগজ-পেনসিল নিয়ে কী-একটা হিশেব করছিলেন, মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। বললেন না কিছু।

আমি আবার বললাম, 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'কী রে? কী?'

কী ক'রে যে কথাটা মুখ দিয়ে বের করতে পেরেছিলাম, আজ

পর্যন্ত আমি তা জানি না। কিন্তু সত্যি-সত্যি আমি নিজেবে বলতে শুনলাম : 'আমি মায়াকে বিয়ে করবো।'

'তুই!' মা-র শান্ত মুখে হঠাৎ দেখলাম রোগযন্ত্রণার মতো রেখাপাত।

'হ্যাঁ, আমি।'

মা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর 'তোর মাথায় এ-সব ঢুকিয়েছে কে, শুনি?'

আমি বললাম : 'এ ছাড়া আর-কিছু হ'তে পারে না, মা।'

মা চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর মুখের রেখাগুলি নরম হ'য়ে এলো আস্তে-আস্তে, তারপর হাসির আভাস ফুটলো ঠোঁটে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে-শুনতে আমি বললাম, 'কিছু বলছো না যে?'

'পাগলা!' ব'লে মা হিশেবের কাগজে চোখ নামালেন।

'কেন, মা, কেন?' ব্যাকুল আবেগে আমি বলতে লাগলাম: 'এ তো শুধু আমার কথাই নয়—ওকে—মায়াকে যদি জিগেস করো—ওর মনের কথা যদি মানো—ওর সুখ যদি চাও—'

কথা শেষ করতে পারলাম না, গলা শুকিয়ে এলো, মনে হ'লো দম আটকে ম'রে যাবো। তখন মা আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি যা বলছো তা তো হবার নয়।'

'কেন, মা, কেন?' কত কথার আকুলিবিকুলি বুকের মধ্যে, কিন্তু গলা দিয়ে বেরোয় শুধু কান্নার মতো কষ্টের একটা 'কেন'।

'কেন, জিগেস করছো?' হাতের পেনসিলটা মা নামিয়ে রাখলেন মেঝেতে। 'তোমার অপর্ণা-দিকে ভুলে গেলে এর মধ্যে? ঐ মানুষেরই বোনের সঙ্গে আবার—আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না, জেনো।'

আমি নিঃশব্দ, আমি রুদ্ধশ্বাস।

'আর ও-কথা মনেও এনো না তুমি।...কষ্ট?' আমার মুখের দিকে মা এমন ক'রে তাকালেন যে আমার লজ্জা করলো এ-কথা ভেবে যে আমাকে দুঃখীর মতো দেখাচ্ছে—তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করলুম, কিন্তু মা তবু দয়া করলেন না আমাকে, আরো বলতে লাগলেন, 'তোমার কষ্ট? অপর্ণার কথা ভাবো কখনো মনে-মনে? ও-মেয়েটাকে নিয়ে খুব তো সুখ হ'লো আমার—এখন তুমি বুঝি এলে মায়ার জীবন নষ্ট করতে!'

নষ্ট!

'মায়াকে তুমি সত্যি যদি ভালোবাসো, তবে নিশ্চয়ই তুমি ভালো হবে, তাকে সুখী হ'তে দেবে।' আদেশের সুরে এ-কথা ব'লে মা উঠে দাঁড়ালেন একটা ক্ষুদ্র বিষয়ের দ্রুত নিষ্পত্তি ক'রে। যদিও আমি তাঁর চাইতে এক মাথা লম্বা, তবু তাঁর সামনে অত্যন্ত ছোটো মনে হ'লো নিজেকে। কথা বললুম না, আর বলবার কী ছিলো? আমি ভালো হলাম, মায়াকে সুখী হ'তে দিলাম; আমি মায়াকে ভালোবাসি।

বৈশাখের প্রথমে দিন স্থির হ'লো। চৈত্রশেষের এক রাত্রে মায়া এলো আমার ঘরে। শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছি—ঐ একটি কাজই তো

জানি আমি। আমার বিছানার পাশে দাঁড়ালো চুপ ক'রে আমার চোখ স'রে এলো বই থেকে তার মুখে।

এক দীর্ঘ মুহূর্ত, আমরা পরস্পরের চোখে তাকিয়ে রইলুম, স্তব্ধ। তারপর মায়া বললো :

'তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম।'

'কী—?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসতাম।'

'জানি।'

মায়া চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, আমার কিছু বলবার অপেক্ষায়। আমি কিছুই বললাম না।

'আর-কিছু তোমার বলবার নেই? একটা কথাও তোমার বলবার নেই আমাকে?'

'অনেক কথাই ছিলো, কিন্তু আর কি সময় আছে।'

'সময় ক'রে নিতে তুমি পারলে না?'

আমি চুপ।

মায়া আবার বললো, 'এখনো কি সময় নেই?'

তখন আমি বালিশে মুখ ঢেকে চাপা গলায় বললা 'থাক—চুপ করো—তুমি যাও।'

আমি ভালো, আমি ভালোবাসি; আমি ভীরু, আমি দুর্বল

শেষ। কালির একটা আঁচড়; একটা দীর্ঘশ্বাস; জানলার বাইরে রাত্রির আকাশ। তারপর ঘুম। ঘুম, স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে তন্দ্রা গোধূলিতে অপর্ণা-দির মুখ কি আজ দেখবো? আমার টেবল-[illegible] আকনা-পরানো, ঘর ভ'রে ছায়া। হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠি: মনে হয় যেন সেই ছায়ার গুহা থেকে অপর্ণা-দি বেরিয়ে এলেন, অন্ধকারে ঐ তো তাঁর আঁচলের অস্পষ্ট ঝিলিমিলি তাঁকে কি আর কখনো দেখবো না? এই পৃথিবীতে, এই জীবনে? আশ্চর্য—কবে তিনি ভেসে গিয়েছিলেন আসামি [illegible]র খরস্রোতে, সেই কথাটাই কি বিধাতা চিরকাল মনে ক'রে রাখলেন? সে-কথা আমিই তো প্রায় ভুলে বসেছি। [illegible]র বিয়ের উপলক্ষ্যে তাঁকে আনতে যে-লোক গৌহাটি গিয়েছিলো, সে ফিরে এসেছিলো একা। অপর্ণা-দি আসেননি। রাত্রে কখন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কেউ জানতে পারেনি। [illegible]দিন দুপুরে জল-পুলিশের এক লঞ্চ ব্রহ্মপুত্রে কুড়িয়ে [illegible]য়েছিলো তাঁকে। বাঁচাবার চেষ্টা করার আর সময় ছিলো না তখন। তিনি আসতে চাননি বিয়েতে, কিছুতেই আসতে চাননি, কিন্তু সব দিক থেকে পিড়াপিড়ি। এড়াবার পথ ছিলো একটাই। কেন আসতে চাননি? কেন চাইবেন? কেন ফেলবেন তাঁর অশুভ ছায়া উৎসবের রাত্রিতে? কেন আনবেন ধ্বংসের [illegible]

মিলনের মুখোমুখি ? তিনিও পেয়েছিলেন মিলনের মায়ালোক— এই বাড়িতেই—মাত্রই কয়েক বছর আগে—কেন সহ্য করবে স্মৃতির নির্মম প্রহার ?...দোষ দিই না তাঁকে, শুধু খারাপ লাগে এ-কথা ভাবতে যে তাঁকে পাওয়া গিয়েছিলো। [illegible] সুন্দর মানুষ, অমন সুন্দর মেয়ে—কেমন জানি [illegible] হয়েছিলেন ?···কিন্তু সে-কথা আমি মনেও আনি না : মনে-মনে বলি, তুমি নদী, অপর্ণা-দি, তুমি জলের মধ্যে জল, তুমি নদীর লাবণ্য, তুমি স্রোতের আনন্দ। আমি [illegible] ভাবি না যে তুমি নেই ; আমার ভাবনার আকাশে ছবির পর ছবি ভেসে যায়—সেখানে অপর্ণা-দি, সেখানে তুমি আর, সেখানে তোমার মুখ জ্বলন্ত তারার মতো, যে-তারা মুখ ধোয় রাত্রির শেষে, একলা আকাশে, কোনো-এক একলা জেগে-থাকা মানুষকে, চুপে-চুপে, পৃথিবীর সকল ঘুমোনো মানুষ লুকিয়ে। এই আমার একা-জাগা রাত্রি, আমার অন্ধকার, আমার নির্জনতা আজ তোমাকে দিলাম—নাও, হাত বাড়িয়ে নাও, একবার বলো যে ভুলে যাওনি।